উপমা কালিদাসস্য

ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত
'রামতনু লাহিড়ী' অধ্যাপক
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্য জগৎ
২০৩।৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট · কলিকাতা-৬



নব সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৬৩

প্রকাশক—কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য জগৎ

২০৩।৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট্

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—

ক্রিয়েটিভ গ্রুপ

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ

ফোটাটাইপ সিণ্ডিকেট

মুদ্রাকর—কার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা

মুদ্রণী

৭১, কৈলাস বসু স্ট্রীট্

কলিকাত-৬

তিন টাকা

দার্শনিকপ্রবর

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের

স্মৃতিতে

প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

কালিদাসের কাব্য আলোচনা করিতে বসিয়া কালিদাসের কথাই মনে পড়িয়া যাইতেছে,—

ক্ব সূর্য-প্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্প-বিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্॥
মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥

"কোথায় সেই সূর্য-প্রভব বংশ,—আর কোথায় আমার অল্প-বিষয়া মতি! মোহবশে আমি ভেলায় দুস্তর সাগর পার হইতে ইচ্ছুক হইয়াছি! মন্দ কবিযশঃ-প্রার্থী আমি শুধু লাভ করিব উপহাস,—যেমন উপহাস লাভ করে বামন প্রাংশুলভ্য ফলের জন্য হাত বাড়াইয়া।" সংস্কৃত-সাহিত্যে আমার যে অল্প-বিষয়া মতি তাহা লইয়া কালিদাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া নিজেই বুঝিতেছি,—আমার এ প্রয়াস নিতান্তই 'মোহাৎ'; – হয়ত প্রাংশুলভ্য ফলে হাত বাড়াইয়া উপহাসই লাভ করিব; কিন্তু কালিদাসই আবার বলিয়াছেন,—

রঘূণামন্বয়ং বক্ষ্যে তনুবাগ্-বিভবোঽপি সন্।
তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রচোদিতঃ॥
তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্-ব্যক্তি-হেতবঃ।
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা॥

'আমার বাগ্-বিভব অতি অল্প থাকা সত্ত্বেও আমি রঘুগণের অন্বয় বর্ণনা করিব; কারণ,– সেই রঘুগণের গুণাবলীই আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়া আমাকে এই চাপল্যে অনুপ্রেরিত করিয়াছে। দোষগুণের বিচারকর্তা সজ্জন-মণ্ডলীই আমার এই বর্ণনা শ্রবণ করিবেন, কাবণ স্বর্ণের বিশুদ্ধি অথবা অবিশুদ্ধি অগ্নিতেই পরীক্ষিত হইয়া থাকে।" কালিদাসের সুরে সুর মিলাইতে ধৃষ্টতাজনিত অপরাধে সঙ্কুচিত হইতেছি,—কিন্তু আমার বক্তব্যও ঠিক ওই কালিদাস যাহা বলিয়াছেন তাহাই; কালিদাসের উপমার সৌন্দর্য এবং মাধুর্য আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে,—সেই মোহবশেই আমি তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি,—'তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রচোদিতঃ'! ইহার ভিতরে কতটুকু খাঁটি আর কতটুকু খাদ তাহার বিচারভার রহিল অগ্নিসদৃশ সহৃদয় পাঠকের কাছে।

গ্রন্থকার

নব সংস্করণের ভূমিকা

'উপমা কালিদাসস্য' বইখানি বিশবৎসর পূর্বে লিখিয়াছিলাম, প্রথম প্রকাশের বই ফুরাইয়া গিয়াছেও আজ অনেক বৎসর। বইখানি আগাগোড়া পরিবর্তিত পরিবর্ধিত করিয়া দিব মনে করিয়াই ফুরাইয়া যাইবামাত্র পুনর্মুদ্রিত করি নাই; কিন্তু ইহার মধ্যে বইখানিকে যতবার পুনর্লেখনের চেষ্টা করিয়াছি ততবারই একটি সত্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, এক বয়সের লেখার উপরে অন্য বয়সে কলম চালান শক্ত; হয় মোটামুটিভাবে যাহা আছে তাহাই রাখিয়া দিতে হয়—না হয় একেবারে নূতন করিয়া লিখিয়া দিতে হয়।

মনে আছে, বইখানি লিখিয়াছিলাম একটা নেশার বশবর্তী হইয়া; কালিদাসের কাব্য পড়িয়া তাঁহার উপমাগুলি আমাকে নেশার মতন পাইয়া বসিয়াছিল; সেই নেশার ঝোঁকেই বই লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। তাহাতে কাঁচামি অনেক আসিয়াছে—এখনও তাহা বেশ চোখে পড়ে; কিন্তু তাহার উপরে বেশি পাকামি আর করিতে ইচ্ছা করিতেছে না।

তবু মূল কাঠামোটি না বদলাইলেও পরিবর্তন পরিবর্ধনও এবারে অনেক করিয়াছি। কালিদাসের উপমাবিচারের পূর্বে সাহিত্যে অলঙ্কারের স্থান কি এ বিষয়ে আলোচনাটি প্রায় নূতন করিয়াই লিখিয়া দিয়াছি। কালিদাসের উপমার আলোচনায়ও পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি উপমা লইয়া আলোচনা করিয়াছি।

যে সকল দোষেগুণে মিলিয়া গ্রন্থখানি রসিকগণের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ-দৃষ্টি লাভ করিয়াছিল এবারেও তাহা করিবে এই আশা লইয়াই গ্রন্থখানির নবসংস্করণ প্রকাশে উৎসাহী হইলাম।

'সাহিত্য জগৎ'-এর পক্ষ হইতে শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সোৎসাহে গ্রন্থখানির প্রকাশভার গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থখানিকে ভালভাবে প্রকাশের চেষ্টায় তিনি কোনও ত্রুটি করেন নাই।

৪১।৩৫ বি, চারু এভেন্যু
কলিকাতা-৩৩
আশ্বিন, ১৩৬৩

বিনীত
গ্রন্থকার

কাব্যে উপমা-প্রয়োগ এবং সাধারণভাবে অলঙ্কার-প্রয়োগের তাৎপর্য

কালিদাসের উপমার কথা প্রসিদ্ধির ভিতর দিয়া এখন প্রায় জনপ্রবাদে পর্যবসিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যালোচনার পরিধি অতিক্রম করিয়া এখন সালঙ্কার বাক্‌চাতুর্যের প্রসঙ্গেও কথাটি শিথিল-ভাবে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। কালিদাসের উপমার কথা আমরা যখন বলি তখন আমরা শুধুমাত্র তাঁহার উপমা-অলঙ্কারের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের কথাই বলি না, তাঁহার অননুকরণীয় সালঙ্কার একটি বিশেষ প্রকাশভঙ্গির কথাই বলি। সুতরাং কালিদাস সম্বন্ধে উপমা কথাটির বাচ্য সর্ববিধ অলঙ্কার। সর্ববিধ অলঙ্কার অর্থে উপমা কথাটির ব্যবহার নিতান্ত অযৌক্তিক বা অসার্থক নয়; উপমাই সর্বপ্রকার অর্থালঙ্কারের মূলীভূত অলঙ্কার। আমরা একটু বিশ্লেষণ এবং বিচার করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইব, কোনও জাতীয় সাদৃশ্য বা সাধর্ম্যই হইল উপমা-অলঙ্কারের মূল—অন্যান্য সকল অলঙ্কারের মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই এই সাদৃশ্য বা সাধর্ম্যের বিবিধ এবং বিচিত্র প্রয়োগ—হয় অস্ত্যর্থকরূপে, না হয় নঙর্থকরূপে। বিরোধ বা বৈসাদৃশ্যও সাদৃশ্য এবং সাধর্ম্যেরই অপরদিক মাত্র।

উপমা অলঙ্কারের এই যে বহু-অলঙ্কার-মূলত্ব এ-বিষয়ে সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণই আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। অপ্যয়্য দীক্ষিত তাঁহার 'চিত্রমীমাংসা' গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

উপমৈকা শৈলূষী সংপ্রাপ্তা চিত্রভূমিকা-ভেদান্।
রঞ্জয়ন্তী কাব্যরঙ্গে নৃত্যন্তী তদ্বিদাং চেতঃ ॥

অর্থাৎ—উপমা হইল একমাত্র নটী—যে বিচিত্রভূমিকা-ভেদ লাভ করিয়া কাব্যরূপ রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করে এবং কাব্যবিদ্‌গণের চিত্ত রঞ্জন করে।

আমরা একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, কথাটি খুব গূঢ়ার্থব্যঞ্জক। কাব্যের ভিতরে কাব্যরসিকগণের চিত্ত রঞ্জন করিবার জন্য যত প্রকারের কলাকৌশল তাহা মূলে ঐ একা উপমারূপিণী নটীরই বিচিত্র লীলাবিলাস। অপ্যয়্য দীক্ষিত তাঁহার নিজের কথা প্রমাণ করিবার জন্য একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মুখ এবং চন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া সব কথাটি বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

চন্দ্র ইব মুখমিতি সাদৃশ্যবর্ণনং তাবদুপমা। সৈবোক্তিভেদেনা-নেকালঙ্কারভাবং ভজতে। তথাহি। চন্দ্র ইব মুখং মুখমিব চন্দ্র ইত্যুপমেয়োপমা। মুখং মুখমিবেত্যনন্বয়ঃ। মুখমিব চন্দ্র ইতি প্রতীপম্। চন্দ্রং দৃষ্ট্বা মুখং স্মরামীতি স্মরণম্। মুখমেব চন্দ্র ইতি রূপকম্। মুখচন্দ্রেণ তাপঃ শাম্যতীতি পরিণামঃ। কিমিদং মুখমুতাহো চন্দ্র ইতি সন্দেহঃ। চন্দ্র ইতি চকোরাস্তন্মুখমনুধাবন্তীতি ভ্রান্তিমান্। চন্দ্র ইতি চকোরাঃ কমলমিতি চঞ্চরীকাস্তন্মুখে রজ্যন্তীত্যুল্লেখঃ। চন্দ্রোঽয়ং ন মুখমিত্যপহ্নবঃ। নূনং চন্দ্র ইত্যুৎপ্রেক্ষা। চন্দ্রোঽয়মিত্যতিশয়োক্তিঃ।

মুখেন চন্দ্রকমলে নির্জিতে ইতি তুল্যযোগিতা। নিশি চন্দ্রস্তন্মুখং চ হৃষ্যতীতি দীপকম্। ত্বন্মুখমেবাহং রজ্যামি চন্দ্র এব চকোরো রজ্যতি ইতি প্রতিবস্তূপমা। দিবি চন্দ্রো ভূবি ত্বন্মুখমিতি দৃষ্টান্তঃ। মুখং চন্দ্রশ্রিয়ং বিভর্তীতি নিদর্শনা। নিষ্কলঙ্কং মুখং চন্দ্রাদতিরিচ্যতে ইতি ব্যতিরেকঃ। ত্বন্মুখেন সমং চন্দ্রো নিশাসু হৃষ্যতীতি সহোক্তিঃ। মুখং নেত্রাঙ্করুচিরং স্মিতজ্যোৎস্নোপশোভিতমিতি সমাসোক্তিঃ। অব্জেন সদৃশং বক্ত্রং হরিণাহিতশক্তিনা ইতি শ্লেষঃ। মুখস্য পুরতশ্চন্দ্রো নিষ্প্রভ ইত্যপ্রস্তুতপ্রশংসা। এবমুক্তানেকালঙ্কারবিবর্তবতীয়মুপমা।

প্রথমতঃ দেখিতে পাই, এখানে 'চন্দ্রের মত মুখ' এই কথা বলিলে চন্দ্র এবং মুখের মধ্যে সৌন্দর্য ও মাধুর্যের যে সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহার বর্ণনে উপমা অলঙ্কার হইল। 'চন্দ্রের মত মুখ' এই কথাটিকেই বলিবার বিচিত্রভঙ্গিভেদে উপমা স্থলে অন্যান্য নানারূপ অলঙ্কার সম্ভব হইয়া ওঠে। যেমন—বলা যায়, 'চন্দ্রের মত মুখ, মুখের মত চন্দ্র' তাহা হইলে পূর্ববাক্যের উপমান (চন্দ্র) এবং উপমেয় মুখ পরবাক্যে বিপরীতভাবে বর্ণিত হইল বলিয়া এখানে 'উপমেয়োপমা' হইল। 'মুখ মুখের ন্যায়' এরূপ বলিলে একই বস্তুতে উপমানত্ব ও উপমেয়ত্ব উভয় ধর্ম পর্যবসিত হইল বলিয়া 'অনন্বয়োপমা' হইল। যদি বলা যায়, 'মুখের মত চন্দ্র' তাহা হইলে প্রসিদ্ধ উপমান চন্দ্রকে উপমেয় (মুখ) রূপে নির্দেশ করাতে 'প্রতীপ' অলঙ্কার হইল। 'চন্দ্রকে দেখিয়া মুখকে স্মরণ করিতেছি' এরূপ করিয়া বলিলে 'স্মরণ' অলঙ্কার হইল। 'মুখই চন্দ্র' এইরূপ বলিলে উপমান উপমেয়ের অভেদসিদ্ধান্তহেতু 'রূপক' হইল। 'মুখচন্দ্রের দ্বারা তাপের উপশম হইতেছে' এরূপ বলিলে 'পরিণাম' অলঙ্কার হইল। 'ইহা কি মুখ না চন্দ্র ?'—এরূপ ক্ষেত্রে 'সন্দেহ' অলঙ্কার। 'চন্দ্র মনে করিয়া

চকোরগণ তোমার মুখের দিকে ধাবিত হইতেছে'—এরূপক্ষেত্রে ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার। 'চন্দ্র মনে করিয়া চকোরগণ এবং কমল মনে করিয়া অলিসমূহ তোমার মুখের প্রতি অনুরক্ত হইতেছে'—এরূপ-ক্ষেত্রে উল্লেখ অলঙ্কার হইল। 'ইহা চন্দ্র, মুখ নয়'—এক্ষেত্রে 'অপহ্নুতি'। 'যেন চন্দ্র'—এখানে 'উৎপ্রেক্ষা'। 'ঐ যে একটি চন্দ্র'—এক্ষেত্রে উপমেয়ের একেবারে উল্লেখ না করিয়া উপমানকেই উপমেয় রূপে নির্দেশ করাতে 'অতিশয়োক্তি' অলঙ্কার হইল। 'মুখদ্বারা চন্দ্র ও কমল উভয়ই নির্জিত হইল'—এখানে 'তুল্যযোগিতা'। 'রাত্রিতে চন্দ্র এবং তোমার মুখ হর্ষযুক্ত হয়'—এখানে 'দীপক'। 'তোমার মুখই—এই বলিয়া আমি আনন্দিত হই—আর চন্দ্রই—এই বলিয়া চকোর আনন্দিত হয়'—এখানে 'প্রতিবস্তুপমা' অলঙ্কার হইল। 'আকাশে চন্দ্র, পৃথিবীতে তোমার মুখ'—এখানে 'দৃষ্টান্ত' অলঙ্কার। 'মুখ চন্দ্রশ্রী ধারণ করিতেছে'—এখানে নিদর্শনা। 'নিষ্কলঙ্ক মুখ চন্দ্র হইতেও অধিক হইয়া উঠিয়াছে'—এখানে 'ব্যতিরেক'। 'তোমার মুখের সহিত চন্দ্র সমভাবে রাত্রিতে হর্ষযুক্ত হয়'—এখানে 'সহোক্তি'। 'নেত্রাঙ্করুচির মুখ স্মিতজ্যোৎস্নায় উপশোভিত'; চন্দ্রই এখানে মুখ, চন্দ্রের অন্তর্গত কালো চিহ্ন সমূহ যেন নেত্রাঙ্ক, জ্যোৎস্না যেন স্মিত হাস্যচ্ছটা; এখানে 'সমাসোক্তি' অলঙ্কার হইল। 'অব্জেন সদৃশ্যং বক্ত্রং 'হরিণাহিতশক্তিনা' বাক্যটিতে 'অব্জ' শব্দের অর্থ চন্দ্রও করা যায় (অপ্ হইতে জাত অর্থাৎ সমুদ্র হইতে জাত); কমলও করা যায়; 'হরিণাহিতশক্তিনা' শব্দের অন্বয় হরিণ+আহিত+শক্তিনা, অথবা হরিণা (হরি কর্তৃক বা সূর্যকর কর্তৃক) উভয়রূপেই করা যায়; সুতরাং এখানে শ্লেষ অলঙ্কার হইল। 'মুখের সামনে চন্দ্র নিষ্প্রভ'—এখানে অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার হইল।

এখানে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি যে, এক মুখ এবং চন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া বাইশটি অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল; এই বাইশটি অলঙ্কারের মূলে যে রহিয়াছে শুধুমাত্র মুখ এবং চন্দ্রের ভিতর-কার সাদৃশ্যকে অবলম্বন করিয়া একটি তুলনা—অর্থাৎ একটি উপমা-অলঙ্কার এ-বিষয়ে কোনও সংশয়ের অবকাশ নাই। লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, অপ্যয়্য দীক্ষিত এই বাইশটি অলঙ্কারকে বলিয়াছেন উপমারই বিবর্তমাত্র। এখানে উপমার 'বিবর্ত' কথাটি বলিবার তাৎপর্য এই যে, মূলে সবই উপমা—উক্তিভেদে পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতীয়মান হইতেছে মাত্র।

সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, কালিদাসের উপমার বিচার-বিশ্লেষণ বা আস্বাদন অর্থ কালিদাসের কাব্য-নাটকাদি হইতে বাছিয়া বাছিয়া শুধুমাত্র কালিদাসের উপমাগুলির বিচার-বিশ্লেষণ বা আস্বাদন নয়; আসলে ইহা কালিদাসের ব্যবহৃত সকল অলঙ্কারের বিচার-বিশ্লেষণ এবং আস্বাদন। এই কাজ করিতে হইলে আমাদের আরও একটি জিনিস সম্বন্ধে একটি পরিচ্ছন্ন ধারণার প্রয়োজন, তাহা হইল সংস্কৃত-সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে 'অলঙ্কার' কথাটির তাৎপর্য। এই অলঙ্কার কথাটি সংস্কৃত সাহিত্য-সমালোচকগণ কর্তৃক দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়; একটি হইল ভাসা-ভাসা অর্থ, অপরটি হইল একটি গভীর অর্থ। ভাসা-ভাসা অর্থে অলঙ্কার কথাটিকে তাহার ব্যবহারিক প্রয়োগ ও মূল্যের মানেই ব্যবহৃত হইতে দেখি। একটি সুপুরুষের যেমন একটি শরীর রহিয়াছে, সেই শরীরের ভিতরে আত্মা রহিয়াছে, শৌর্যবীর্য রহিয়াছে, কাণত্বাদির ন্যায় যেমন কিছু কিছু দোষও থাকিতে পারে, তাহার যেমন অবয়ব-সংস্থানের একটি বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে, —তেমনই এই সকলের সহিত তাহার বিবিধ ভূষণও থাকিতে পারে

যাহা তাহার শোভাকে বর্ধিত করিয়া দেয়। শব্দার্থের শরীর এবং রসের আত্মা লইয়া যে কাব্য-পুরুষ, অলঙ্কার তাহার ভূষণ। অলঙ্কার সম্বন্ধে এইজাতীয় একটি ধারণা-পোষণ করিয়াই বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁহার 'সাহিত্য-দর্পণে' অলঙ্কারের স্থান নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—'কাব্যস্য শব্দার্থৌ শরীরম্, রসাদিশ্চাত্মা, গুণাঃ শৌর্যাদিবৎ, দোষাঃ কাণত্বাদিবৎ, রীতয়োঽবয়ব-সংস্থান-বিশেষবৎ, অলঙ্কারাশ্চ কটক-কুণ্ডলাদিবৎ। অলঙ্কার সম্বন্ধে এই মতবাদ কাব্য-সৃষ্টির ভিতরে অলঙ্কারের স্থান অনেকখানি গৌণ করিয়া দেয়; তাহা থাকিলে ভাল, না থাকিলেও যে কাব্য অচল এমন কথা বলা চলে না।

কিন্তু প্রাচীন আলঙ্কারিকেরাও অলঙ্কার কথাটিকে একটি গভীর অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং অলঙ্কার শব্দের সেই গভীর অর্থকে অবলম্বন করিয়াই সংস্কৃত কাব্য-সমালোচন-শাস্ত্র অলঙ্কার-শাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই ব্যাপক এবং গভীর অর্থে অলঙ্কার শব্দের লক্ষ্য হইল মানুষের চিত্তের অনির্বচনীয় রসানুভূতি সমূহকে পরচিত্তে সংক্রামিত করিয়া দিবার সমগ্র কৌশলটি। আমাদের জীবনের রসানুভূতিগুলি শুধু যে সূক্ষ্ম, সুকুমার এবং অনন্তবৈচিত্র্যশীল তাহা নহে, হৃদয়ের গহনে বহু স্থলেই তাহা অনির্বচনীয় চিৎ-স্পন্দন; এই অনির্বচনীয়কে বচনীয় করিয়া তুলিবার চেষ্টাই হইল আমাদের সকল সাহিত্যচেষ্টা—এমন কি সকল শিল্পচেষ্টা। সাধারণ বচনের দ্বারা প্রকাশ্য নয় বলিয়াই আমাদের রসোদ্দীপ্ত বা রসাপ্লুত চিৎ-স্পন্দন অনির্বচনীয়; সেই অনির্বচনীয়কে বচনীয় করিয়া তুলিবার জন্য তাই প্রয়োজন অসাধারণ ভাষার। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিতে হইবে, ভাষা-শব্দেরও তাৎপর্য হইল চিৎ-স্পন্দনের বহিঃপ্রকাশ-বাহনত্ব। আমাদের অনুভূতির একটি বিশেষ ধর্ম এবং স্বরূপধর্মই হইল এই, তাহাকে

জানাইতে হয়,—পরের কাছে জানাইতে হয়, না হয় অন্ততঃ নিজের কাছেও জানাইতে হয়—এই জানানোর কাজেই যেন অনুভূতির পরিপূর্ণতা। এই অনুভূতির প্রকাশই হইল ভাষা-সৃষ্টির মূল-কারণ; অথবা এ-কথা বলা যাইতে পারে যে, ভাষা সাধারণতঃ অনুভূতিরই প্রকাশমানতা—চিৎ-স্পন্দনের শব্দ-প্রতীক। আজিকার যুগে এ-কথা কেহই মনে করে না যে, জগতে আমরা যে অসংখ্য ভাষা প্রচলিত দেখিতে পাইতেছি, তাহারা চারিপাশের বায়ুমণ্ডলের ভিতরেই ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, মানুষ তাহার প্রয়োজন অনুসারে তাহাকে বাছিয়া লইয়াছে। মানুষ সেই আদিম যুগ হইতে নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য নিত্যই ভাষা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। পশুপক্ষীর ন্যায় মানুষও হয়ত কোনদিন শুধুমাত্র ধ্বনির পরিমাণ-বৈচিত্র্য এবং প্রকার-বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়াই নিজের অন্তরের ভাব প্রকাশ করিত; অন্তরের ভাবের ভিতরে যত আসিতে লাগিল সূক্ষ্মতা, জটিলতা এবং গভীরতা—ধ্বনির পরিমাণ-বৈচিত্র্য এবং প্রকার-বৈচিত্র্যের মধ্যেও আসিতে লাগিল ততই সূক্ষ্মতা, জটিলতা ও গভীরতা, ক্রমেই সৃষ্টি হইতে লাগিল সুসমৃদ্ধ বিশেষ বিশেষ ভাষার। কোনও কোনও বৈয়াকরণ মনে করেন যে, আদিতে ভাষ্ ধাতু (কথা বলা) ভাস্ ধাতুর (প্রকাশ পাওয়া) সহিতই যুক্ত ছিল।

কিন্তু একজন কবিকে এই ভাষার ভিতর দিয়া যে অন্তর্লোকের পরিচয় দিতে হয় তাহা তাঁহার একটি বিশেষ অন্তর্লোক,—এই অন্তর্লোকের স্পন্দন সর্বসাধারণের হৃৎ-স্পন্দন হইতে অনেকখানি স্বতন্ত্র,—সাধারণ ভাষার ভিতরে তাই তাহাকে বহন করিবারও শক্তি থাকে না। কবির সেই বিশেষ হৃৎ-স্পন্দন তখন তাই গড়িয়া লয় তাহার বাহন একটি বিশেষ ভাষাকে,—সেই 'বিশেষ' ভাষাকেই আমরা

নাম দিয়াছি 'সালঙ্কার' ভাষা। আমরা কবির কাব্যের যে সকল ধর্মকে সাধারণতঃ অলঙ্কার নাম দিয়া থাকি, একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব, সেই অলঙ্কার কবির সেই বিশেষ ভাষারই ধর্ম। কবির কাব্যানুভূতি ঐরূপ চিত্র, ঐরূপ বর্ণ, ঐরূপ ঝঙ্কার লইয়াই বাহিরে আত্ম-প্রকাশ করে। যেখানেই কবির বিশেষ কাব্য-রসানুভূতি বাহিরে এই বিশেষ ভাষার ভিতরে মূর্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই, সেইখানেই আর সত্যকার কাব্য রচনা হইতে পারে নাই।

রস-সমাহিত চিত্তের এই স্পন্দনকে প্রকাশ করিবার জন্য কবির যে এই 'বিশেষ' বা অসাধারণ ভাষা তাহার পরিচয় বিভিন্ন সাহিত্য-সমালোচক বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ভাবে দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভামহ ইহাকে বলিয়াছেন বক্রোক্তি—'সৈষা সর্বৈব বক্রোক্তিঃ'। ভামহের আলোচনা পড়িলে বেশ বোঝা যায়,—এই বক্রোক্তি বলিতে তিনি সোজাভাবে কথা না বলিয়া তাহাকে খানিকটা ঘুরাইয়া বাঁকাভাবে কথা বলিবার চাতুর্যকে মনে করেন নাই,—বক্রোক্তির এখানে অর্থ হইল, কাব্যোচিত বিশেষোক্তি। অলঙ্কারাদি এই বিশেষোক্তিরই পর্যায় মাত্র। ভামহই আরও একটি সূক্ষ্ম কথার ইঙ্গিত করিলেন, তাহা হইল এই যে 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্'—শব্দ ও অর্থের সহিতত্বই হইল কাব্যত্ব। এখানকার এই 'সহিত' কথাটি হইতে কাব্যের পরিবর্তে ব্যাপকার্থে সাহিত্য কথাটির ব্যবহার আমরা পরবর্তী কালে দেখিতে পাই। এখানে 'সহিত' শব্দের তাৎপর্য কি? ভাবগূঢ় অর্থের মধ্যে যে সম্ভাবনা ও শক্তি নিহিত আছে তাহা যদি শব্দশক্তি দ্বারা যথাযথ ভাবে প্রকাশিত বা প্রতিফলিত হইয়া থাকে তবেই বলা যাইতে পারে যে শব্দ ও অর্থের সহিতত্ব সাধিত হইয়াছে। অর্থশক্তি সম্পূর্ণরূপে যদি শব্দশক্তির মধ্যে সমর্পিত না হয়, '[illegible]' যদি

অনুরূপ 'তনু' লাভ না করে, তবে উভয়ের অ-সাহিত্যে কাব্যত্বেরই অসদ্‌ভাব ঘটিল।

এই প্রসঙ্গে ভামহ আরও একটি সূক্ষ্ম কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কাব্যোক্তি সর্বক্ষেত্রেই অতিশয়োক্তি। কথাটির মধ্যে একটি গভীর সত্য নিহিত আছে। একদিক হইতে দেখিতে গেলে শিল্পকৃতি মাত্রই হইল 'বাড়াইয়া বলা'। সর্ববিধ শিল্পের প্রধান কাজই হইল একজনের ভাবকে সর্বজনের করিয়া তোলা, মুহূর্তের ভাবকে সর্বকালের করিয়া তোলা। অনেকখানি না বাড়াইয়া তুলিয়া আমরা তাহা কখনই করিতে পারি না। তাহা ছাড়া, শিল্পীর নিজের নিকটে যে রসানুভূতি প্রত্যক্ষ, পাঠক, শ্রোতা বা দর্শকের নিকট তাহা পরোক্ষ; তাই চিদ্‌গত রসানুভূতিকে প্রকাশভঙ্গির ভিতর দিয়া অনেকখানি বাড়াইয়া তুলিতে না পারিলে পাঠক, শ্রোতা বা দর্শক রসের সমগ্রতা লাভ করিতে পারে না। এ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

"আমার সুখদুঃখ আমার কাছে অব্যবহিত, তোমার কাছে তাহা অব্যবহিত নয়। আমি হইতে তুমি দূরে আছ। সেই দূরত্বটুকু হিসাব করিয়া আমার কথা তোমার কাছে কিছু বড় করিয়াই বলিতে হয়।

"সত্য-রক্ষণ-পূর্বক এই বড় করিয়া তুলিবার ক্ষমতায় সাহিত্যকারের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। যেমনটি ঠিক তেমনটি লিপিবদ্ধ করা সাহিত্য নহে; কারণ, প্রকৃতিতে যাহা দেখি, তাহা আমার কাছে প্রত্যক্ষ, আমার ইন্দ্রিয় তাহার সাক্ষ্য দেয়। সাহিত্যে যাহা দেখায়, তাহা প্রাকৃতিক হইলেও তাহা প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং সাহিত্যে সেই প্রত্যক্ষতার অভাব পূরণ করিতে হয়।"

এই বড় করিয়া বলিবার প্রয়োজন শুধু মাত্র প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষতার জন্য নহে; শিল্পে আমাকে নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীকে যে কয়েকটি মুহূর্ত এবং স্বল্প আয়তনের ভিতরে বিধৃত করিতে হইবে। দেশ-দেশ-ব্যাপ্ত একটি সুদীর্ঘ জীবনের সকল সুখদুঃখ, হাসি-অশ্রুভরা বহু মানবের জীবন-মহিমাকে আমাকে এক প্রহরে অভিনীত একখানি নাটকের ভিতরে প্রকাশ করিতে হইবে; কলাকৃতি দ্বারা তাই একটি রঙ্গমঞ্চের পরিধিকে বাড়াইয়া বিপুলা পৃথ্বীর প্রতিভূ করিয়া তুলিতে হইবে, এক-প্রহর কালকে শুধু বহুবর্ষের নয়—নিরবধি কালেরই প্রতিভূ করিয়া তুলিতে হইবে। একজন অভিনেতার অভিনয়-নৈপুণ্যই বা কি? অনেক যুগের, অনেক দেশের অনেক কথাকে নির্দিষ্ট দেশ-কালের সীমার মধ্যেই যতখানি সম্ভব আভাসিত করিয়া তোলা। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আমরা কথায় যে সুর লাগাই তাহা সীমাবদ্ধ এতটুকু কথাকে সীমাহীন ব্যাপ্তি এবং অসীম রহস্যমহিমা দান করিবার জন্যই। অনন্ত দিগ্বলয়বিস্তৃত উদয়াচলে নিত্যকালের সূর্যোদয়ের মহিমাকে কেন্দ্রীভূত করিতে হয় একটি শিল্পীকে এক টুকরা কাগজের উপরে—কয়েকটি রেখা এবং কিছু রঙের সাহায্যেই; সেই রঙ-রেখার মধ্যে আনিতে হয় তাই ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎকে আভাসিত করিবার শক্তি—তাহাই ত যথার্থ চিত্রকলা।

আমার মনে হয় ভামহের 'সৈষা সর্বৈব বক্রোক্তিঃ' কথার মধ্যে এবং বক্রোক্তিকে অতিশয়োক্তি বলিয়া বর্ণনা করিবার ভিতরে শিল্পক্ষেত্রে এই বড় করিয়া বলিবার আভাস রহিয়াছে। শিল্পের ভাষাকে পাশ্চাত্যেও তাই বলা হইয়াছে 'The hightened language'। ভামহের মতে অলঙ্কার প্রভৃতি আসলে আর কিছুই নয়—কাব্যার্থকে যথা-সম্ভব 'অতিশয়' বা বড় করিয়া তুলিবার চেষ্টা।

অতিশয়োক্তিকেই তাই ভামহ সর্বপ্রকার অলঙ্কারের মূল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আলঙ্কারিক দণ্ডীর মধ্যেও ভামহের এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়। তাহার মতেও প্রায় সমস্ত অলঙ্কারের কাজই হইল অর্থকে অনেকখানি বাড়াইয়া দেওয়া এবং সেইজন্যই তিনি মনে করেন, সমস্ত অলঙ্কারেই অতিশয়োক্তির বীজ নিহিত আছে। পরবর্তী কালে 'কাব্য-প্রকাশ'কার মম্মট ভট্টও অতিশয়োক্তিকে সমস্ত অলঙ্কারের প্রাণ-স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

ভামহ-কথিত এই 'বক্রোক্তি' কথাটিকে নানাভাবে বিস্তার করিয়া পরবর্তী কালে (দশম বা একাদশ শতাব্দীতে) রাজানক কুন্তক তাঁহার প্রসিদ্ধ 'বক্রোক্তি-কাব্য-জীবিত'বাদ, অর্থাৎ বক্রোক্তিই কাব্যের প্রাণ-স্বরূপ এই মত প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভেই কুন্তক বলিয়াছেন,—সাধারণতঃ পণ্ডিতগণ ত্রিভুবনের ভাব সকলকে যথাতত্ত্ব বিবেচনা করিবার চেষ্টা করেন; অর্থাৎ ভাব যে-রূপের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং যে-রূপের সহিত সে প্রায় অদ্বয়যোগে যুক্ত হইয়া আছে তাহাকে বাদ দিয়া তত্ত্বমাত্ররূপে তাঁহারা ভাবকে বিবেচনা করিতে এবং বুঝিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু এ চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ চেষ্টা; কারণ এ চেষ্টা দ্বারা আমরা ভাবকে যে তত্ত্বমাত্রে লাভ করি তাহার ভিতরে ভাবের বিস্ময়কর রহস্য অনেকখানিই হয়ত আমরা হারাইয়া ফেলি। কিংশুকপুষ্পকে তাহার সকল রূপ বাদ দিয়া যদি কেবল রক্তবর্ণমাত্র করিয়া গ্রহণ করা যায়, ভাবকেও শুধু যথাতত্ত্বে অবস্থিত বলিয়া গ্রহণ করিতে গেলেও সেইরূপ হইবে। এই চেষ্টা দ্বারা মানুষ স্ব স্ব মনীষা বলেই ভাব সমূহের কতগুলি তত্ত্ব যথারুচি আবিষ্কার করিয়া লয়; এই-জাতীয় যথাভিমত তত্ত্বদর্শনের ফলে জ্ঞানদার্ঢ্যই প্রকাশিত হয়, ভাবের পরমার্থ বা যথার্থ স্বরূপ হয়ত ইহাতে

লাভ হয় না; পরমার্থ হয়ত আমরা এইরূপে যেমন করিয়া কল্পনা করি মোটেই তাদৃশ নয়। সুতরাং ভাবের এই-জাতীয় স্বতন্ত্র তত্ত্ব—অর্থাৎ সৃষ্টির ভিতর দিয়া—রূপের ভিতর দিয়া তাহার যে প্রকাশময় সত্তা তাহাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া ভাবের একটি 'অসঙ্গ' 'কেবল'-তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা ভুল। এই জন্য ভাব এবং রূপের ভিতরকার যে সাহিত্য তাহার সার-রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার মানসেই কুন্তক এই সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন।—

> যথাতত্ত্বং বিবেচ্যন্তে ভাবাস্ত্রৈলোক্যবর্তিনঃ।
> যদি তন্নাদ্ভুতং ন স্যাদেব রক্তা হি কিংশুকাঃ॥
> স্বমনীষকয়ৈবাথ তত্ত্বং তেষাং যথারুচি।
> স্থাপ্যতে প্রৌঢ়িমাত্রং তৎ পরমার্থো ন তাদৃশঃ॥
> ইত্যসত্তর্কসন্দর্ভে স্বতন্ত্রে ২প্যকৃতাদরঃ।
> সাহিত্যার্থসুধাসিন্ধোঃ সারমুন্মীলয়াম্যহম্॥

কুন্তকের মতে কাব্য বা সাহিত্যের যে 'অদ্ভুতামোদচমৎকার' সারবস্তু তাহা দ্বিতয় অর্থাৎ দ্বিবিধলক্ষণযুক্ত; তাহার একদিকে রহিয়াছে তত্ত্ব অন্যদিকে রহিয়াছে নির্মিতি—'যেন দ্বিতয়মিত্যেত্তত্ত্বনির্মিতিলক্ষণম্'।

কুন্তকের উপরি-উক্ত মতগুলি আলোচনা করিলে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, কুন্তক কাব্যের 'সাহিত্য'-লক্ষণের উপরেই খুব জোর দিয়াছেন। এই সাহিত্যত্ব ফুটিয়া উঠিবে কিসের ভিতর দিয়া? তাহা ফুটিবে 'তত্ত্ব' ও 'নির্মিতি'র সুষ্ঠু মিলনের মধ্য দিয়া—অর্থ ও শব্দের অটুট সম্পৃক্তির ভিতর দিয়া। ইহার কোনও দিককে বাদ দিয়া কোনও দিক সার্থক নয়। কুন্তক বলিয়াছেন, স্পন্দিতচিত্তে যে কবি-বিবক্ষা তাহার একটি বিশেষ ধর্ম রহিয়াছে। কাব্যের ভাষাগুলিব

কাহাকে? কবিচিত্তের তৎকালধৃত যে এই চিত্তস্পন্দনজাত বিশেষ বিবক্ষা তাহাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করিবার যে ক্ষমতা তাহাই হইল তাহার বিশেষবাচকত্বলক্ষণ,—'কবিবিবক্ষিতবিশেষাভিধানক্ষমত্বমেব বাচকত্বলক্ষণম্'। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন,—'যস্মাৎ প্রতিভায়াং তৎকালোল্লিখিতেন কেনচিৎ পরিস্পন্দেন পরিস্ফুরন্তঃ পদার্থাঃ প্রকৃতপ্রস্তাব-সমুচিতেন কেনচিদুৎকর্ষেণ বা সমাচ্ছাদিতস্বভাবাঃ সন্তো বিবক্ষাবিধেয়ত্বেনাভিধেয়তাপদবীমবতরন্তঃ তথাবিধবিশেষ-প্রতিপাদনসমর্থেন অভিধানেন অভিধীয়মানাশ্চেতনচমৎকারিতা-মাপদ্যন্তে।' যথার্থ-প্রতিভাশীল ব্যক্তির হৃদয়ে যখন বাহিরের কোনও পদার্থ ধরা দেয় তখন তাহা তাহার বাহিরের রূপ লইয়াই আসিয়া দেখা দেয় না, তাহা একটা সমাচ্ছাদিতস্বভাব লইয়াই দেখা দেয়—অর্থাৎ বহির্বস্তুর উপরে কবির তৎকালোচিত একটি বিশেষ হৃৎস্পন্দনের অলৌকিক মায়াস্পর্শ পতিত হইয়া তাহাকে একটি বিশেষ অলৌকিক মহিমায় উদ্ভাসিত করিয়া তোলে; এই যে নবোদ্ভাস তাহার ভিতরে বহির্বস্তু তাহার প্রকৃতরূপেও মহিমান্বিত হইতে পারে—প্রকৃতরূপকে অতিক্রম করিয়া একটি উৎকর্ষবিশেষের মধ্যেও মহিমান্বিত হইয়া উঠিতে পারে; এই নবোদ্ভাসিত বিষয়বস্তু তখন তাহার বস্তুস্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া কবিচিত্তে একটি চিন্ময়রূপ ধারণ করে, এই চিন্ময়রূপের পরিণতিই একটি কবিবিবক্ষায়; ইহাই কবির আত্ম-প্রকাশ বা আত্মসৃষ্টির তাগিদ; এই বিবক্ষাই তখন একটি বিশেষ অভিধেয় বা বিশেষ বাচ্য হইয়া উঠিল। এই বিশেষবাচ্যকে ঠিক ঠিক তদনুরূপ বাচকের দ্বারা—অর্থাৎ একটি বিশেষ নির্মিতির দ্বারা যখন বাহিরে স্থাপন করা গেল সেই শিল্পকৃতিই তখন রসিকজনের চেতনচমৎকারিতার কারণ হয়। এই যে 'বিশেষাভিধানক্ষমত্ব' ইহাকেই কুন্তক বলিয়াছেন

বক্রোক্তি। কাব্যের অলঙ্কারাদি হইল নিরন্তর এই বক্রোক্তির সাহায্যে তত্ত্বরূপ বাচ্যের অনুরূপ নির্মিতির বা বাচকের সম্ভব করিয়া তুলিবার চেষ্টা। বক্রোক্তি-সাধিত এই নির্মিতি ব্যতীত জগতের কোনও সত্যের মহিমাই যথার্থ প্রকাশ লাভ করিতে পারে না।

অভিনব গুপ্ত প্রভৃতি যাঁহারা রসধ্বনিকেই কাব্যের আত্মা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁহারাও কাব্য-সৃষ্টির ভিতরে অলঙ্কারকে মুখ্য স্থান দান করিয়াছেন। প্রতিভাশালী কবির পক্ষে কাব্যের নির্মিতি কোনও পৃথক্ যত্নকৃত বস্তু নহে। যেমন জলধারা কোনও কুম্ভে পতিত হইয়া কুম্ভটি কানায় কানায় ভরিয়া গেলে আপনিই আপনার নিজের ছন্দে ও ভঙ্গিতে উচ্ছলিত হইয়া বাহিরে উপছাইয়া পড়ে, তেমনই রসের আবেদনে চিত্ত যখন কানায় কানায় ভরিয়া যায় তখন আপনি তাহা তাহার প্রকাশের পথ সৃষ্টি করিয়া একই বেগে বাহিরে প্রকাশ-মূর্তি লাভ করে। আদিকবি বাল্মীকি মুনি কি করিয়া প্রথম কাব্যসৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই প্রসঙ্গে অভিনব গুপ্ত ভারী চমৎকার করিয়া বলিয়াছেন,—"সহচরীহননোদ্ভূতেন সাহচর্যধ্বংসনেনোত্থিতো যঃ শোকঃ···স এব···আস্বাদ্যমানতাং প্রতিপন্নঃ করুণরসরূপতাং লৌকিকশোকব্যতিরিক্তাং স্বচিত্তবৃত্তিসমাস্বাদ্যসারাং প্রতিপন্নে রসঃ পরিপূর্ণকুম্ভোচ্ছলনবৎ········· সমুচিতছন্দোবৃত্তাদিনিয়ন্ত্রিতশ্লোকরূপতাং প্রাপ্তঃ।" ক্রৌঞ্চের যে শোক তাহা লৌকিক শোকরূপতা পরিত্যাগ করিয়া কবিচিত্তের ভিতরে পরমাস্বাদ্য রূপ একটি অলৌকিক করুণ-রসের রূপ ধারণ করিল; সেই করুণরসই কবিগুরুর চিত্তকুম্ভকে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া বাহিরে উচ্ছলিত হইয়া পড়িল—সেই উচ্ছলনই সমুচিত ছন্দ, বৃত্তি প্রভৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া শ্লোকরূপতা প্রাপ্ত হইল অভিনব গুপ্ত তাঁহার আলঙ্কারিক ভাষায় যে-কথা

বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবির ভাষায় বাল্মীকির প্রথম কবিকর্ম সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই বলিয়াছেন। হিমালয়ের উচ্চ-শিখরস্থ কন্দরে যেদিন আষাঢ়ের 'দুর্দাম দুর্বার' বেগ নামিয়া আসে তখন সে সহসা নিজেই নিজের খাত কাটিয়া নিজের ভঙ্গিতে স্বচ্ছন্দধারায় নামিয়া আসে; কবিগুরু বাল্মীকির হৃদ্‌গত ভাব-সম্বেগও তেমনই স্বচ্ছন্দধারায় শ্লোকরূপ প্রাপ্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল। পার্বত্য ঝর্ণা কোন্ বিচিত্র নৃত্যভঙ্গিতে উপলবন্ধুর পথে খাত কাটিয়া কোথায় কলস্বনে—কোথায় উচ্ছ্রিয়মাণ গর্জনে—কোথায় কূলে কূলে কোন্ পুষ্পাভরণে ভূষিতা হইয়া বহিয়া চলিবে তাহা যেমন তাহার ভাব-সম্বেগ এবং রস-সম্পদ্ ব্যতীত আর কেহ বলিতে পারে না,—একজন যথার্থ শিল্পীর ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই ঘটিয়া থাকে; সেখানেও—

এ যে সঙ্গীত কোথা হ'তে উঠে,
এ যে লাবণ্য কোথা হ'তে ফুটে,
এ যে ক্রন্দন কোথা হ'তে টুটে
অন্তর বিদারণ।

অলঙ্কারের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া ধ্বনিবাদিগণ বলিয়াছেন,—

রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ।
অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্যঃ সোঽলঙ্কারো ধ্বনৌ মতঃ॥

অর্থাৎ রসের দ্বারা আক্ষিপ্ত হইবার জন্যই যাহার বন্ধ বা সৃষ্টি সম্ভব এবং যাহা অপৃথক্-যত্ন দ্বারাই সাধিত হয়—তাহাই হইল অলঙ্কার, ইহাই হইল ধ্বনিবাদিগণের মত। ইহাকেই ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে,—নিষ্পত্তৌ আশ্চর্যভূতোঽপি যস্য অলঙ্কারস্য রসাক্ষিপ্ততয়া

এব বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ'—যে অলঙ্কারের সৃষ্টি আশ্চর্যভূত হইলেও রসের আক্ষেপে অতি সহজেই যেন সম্ভব হইয়া ওঠে—এই জাতীয় অলঙ্কারই যথার্থ্য অলঙ্কার বলিয়া গ্রাহ্য। এখানে এই রসের আক্ষেপ এবং অপৃগ্‌-যত্ন-নির্বর্ত্য—এই কথা দুইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। আসলে দুইটি কথা একই কথা।

আমাদের সাধারণ বিশ্বাস, আমাদের হৃদয়ে আমরা প্রথমে একটা রসানুভূতি লাভ করি। পরে আমরা বিশেষ সচেতন যত্নপূর্বক হৃদয়ধৃত সেই অনির্বচনীয় অনুভূতিকে যথোপযুক্ত সালঙ্কার ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করি। এই দ্বিতীয় প্রয়াসটি যেন একটি পৃথক্ প্রয়াস। প্রথম প্রয়াসে রাসাস্বাদ—দ্বিতীয় প্রয়াসে নানা কলা-কৌশলে সেই রসের সুষ্ঠু পরিবেশন। আমাদের এই সাধারণ ধারণাটি ভুল; এখানে দুইটি পৃথক্ প্রয়াস নয়—দ্বিতীয় প্রয়াসটি প্রথম প্রয়াসেরই একটি সহজ এবং স্বাভাবিক পরিণতি। রসানুভূতিই নিজেকে উপযুক্ত ভাষাবাহন অলঙ্কাররূপে আক্ষিপ্ত করে,—সুতরাং একজন শিল্পী যে চিত্ত-প্রয়াসে রসবিধারণ করেন—সেই চিত্তপ্রয়াসেই অলঙ্কারাদির ভিতর দিয়া রস-প্রস্ফুটন করেন। এইজন্য প্রতিভাশালী শিল্পীর ক্ষেত্রে প্রকাশচেষ্টার মধ্যে কোনও ক্লেশ নাই। আমরা শিল্পীর শিল্প যখন রচিত হয় তখন বিস্মিত হইয়া চাহিয়া থাকি—কেমন করিয়া সৃষ্টি হইল এমন অপূর্ববস্তু! কালিদাসের কাব্যে তাঁহার উপমা প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া আমরা অভিভূত হইয়া যাই—একটার পব একটা—সমুদ্রের নিরবচ্ছিন্ন উর্মির ন্যায় আসিতেছেই আসিতেছে। তাহার ভিতরকার একটার নির্মাণ-নৈপুণ্য এবং ব্যঞ্জনাগর্ভতার আমরা যখন বিচার বিশ্লেষণ করি, তখন ভাবি—এমন একটা কথাই বা কালিদাসের মনে উদিত হইল কি করিয়া—!

তারপরেই ফিরিয়া দেখি—এই রকমই অজস্র—অফুরন্ত। কি করিয়া ইহা সম্ভব হয়! ইহার উত্তর দিয়াছেন ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন। তিনি বলিয়াছেন,—'অলঙ্কারান্তরাণি নিরূপ্যমাণদুর্ঘটনান্যপি রসসমাহিত-চেতসা প্রতিভানবতঃ কবেরহংপূর্বিকয়া পরাতপন্তি।' অলঙ্কারগুলিকে এমনি যদি বিচার করা যায় তবে মনে হয় যে এগুলি একেবারেই দুর্ঘট। কিন্তু তথাপি এই রসসমাহিত প্রতিভাবান্ কবির চিত্তে রসের আক্ষেপেই এগুলি যেন—'আমি আগে, আমি আগে'—এমনি করিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া বাহির হইয়া আসে। আনন্দবর্ধনের এই কথা-গুলির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন,—'নিরূপ্যমাণানি সন্তি দুর্ঘটনানি। বুদ্ধিপূর্বং চীকির্ষিতমপি কর্তুমশক্যানি। তথা নিরূপ্যমাণত্বে দুর্ঘটনানি। কথমেবং রচিতানীত্যেবং বিস্ময়াবহানি।' অর্থাৎ এই জাতীয় অলঙ্কার সৃষ্টি করিতে গিয়া বা তাহাদের নির্মাণ-কৌশল পর্যবেক্ষণ করিলে মনে হয়, এগুলি একান্তই দুর্ঘট। বুদ্ধির সাহায্যে করিবার অনেক চেষ্টা করিলেও এগুলি করিতে কেহ সক্ষম হয় না। তাহার পর এই দুর্ঘট বস্তুগুলিই যখন সম্ভব হইয়া ওঠে, তখন আশ্চর্যান্বিত হইয়া যাইতে হয়—কিরূপে হইল এগুলি সৃষ্টি—এমন বিস্ময়কর বস্তু।

অলঙ্কারের এই রসসম্বেগ হইতেই স্বতঃ-উৎসারণের মতবাদ-প্রসঙ্গে আমরা পাশ্চাত্য দার্শনিক-সমালোচক ক্রোচের মতবাদের সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে পারি। চিত্তের রস-বিধারণ (intuition) এবং বহিঃপ্রকাশ (expression)—এই দুইটি জিনিসকে তিনি দুইটি প্রক্রিয়াজাত বলিয়া মনে করেন নাই। চিত্তে যথার্থ রসানু-ভূতি ঘটিয়াছে, কিন্তু যথোপযুক্ত প্রকাশলাভ করিতে পারে নাই—এমন একটি মতকে তিনি আদৌ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তিনি

মনে করেন, শিল্পের বহিঃপ্রকাশের সম্ভাবনা বীজাকারে অন্তরের রসানুভূতির ভিতরেই নিহিত থাকে—যেমন করিয়া নিহিত থাকে একটি বিরাট মহীরুহের শাখা-প্রশাখা কিশলয়-পল্লব ফুলফলের সকল রেখা,বর্ণ, গন্ধ, স্বাদসম্পন্ন প্রকাশ-সম্ভাবনা একটি সূক্ষ্ম বীজের মধ্যে। ক্রোচের মতে তাই সাহিত্যের রস এবং সাহিত্যের ভাষার মধ্যে রহিয়াছে একটা অদ্বয়যোগ। যে প্রক্রিয়ায় জীবন ও জগৎকে অবলম্বন করিয়া কোনও রসানুভূতি আমাদের চিত্তে উন্মীলিত হয়, ঠিক সেই প্রক্রিয়াতেই তাহার প্রকাশ—যে-রূপে সে আমাদের চিত্তে উন্মীলিত হইয়া ওঠে সেইরূপেই তাহার প্রকাশ। ক্রোচের বর্ণিত এই যে বীক্ষা-শক্তি (aesthetic faculty) এবং প্রকাশ-শক্তির ভিতরকার অদ্বয়বাদ ইহা হয়ত আমরা স্বীকার করিতে পারি—না-ও করিতে পারি ; কিন্তু এ-কথা ঠিক যে, কোনও বহির্বস্তুর অবলম্বনে আমাদের চিত্তের মধ্যে যখন রসোদ্রেক হয়, তখন সেই রসোদ্রেকের স্ফুটতা, সূক্ষ্মতা, গভীরতা—তাহার কমনীয়তা বা প্রচণ্ডতার ভিতরেই থাকে ভাষাময়রূপে তাহার প্রকাশের স্ফুটতা, সূক্ষ্মতা, গভীরতা—তাহার কমনীয়তা বা প্রচণ্ডতা। ভাষার এই সকল সৌকুমার্য বাহির হইতে কিছুই 'কটক-কুণ্ডলাদি'র ন্যায় জুড়িয়া দেওয়া নয়—কাব্য-পুরুষের ইহাই স্বাভাবিক দেহধর্ম। অভিনব গুপ্তও এইজন্য স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—

'ন তেষাং বহিরঙ্গত্বং রসাভিব্যক্তৌ।'

কবি কালিদাস নিজে এ-বিষয়ে অদ্বয়বাদী ছিলেন। তাঁহার এই অদ্বয়বাদ যেমন তাঁহার সকল কবি-কর্মের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি আবার দুই একটি পরোক্ষ উক্তির ভিতর দিয়াও প্রকাশ

পাইয়াছে। আমরা কালিদাসকৃত 'রঘুবংশ'-কাব্যের প্রথম শ্লোকটিতেই লক্ষ্য করিতে পারি, তিনি জগতের মাতা-পিতা পার্বতী-পরমেশ্বরকে প্রণাম করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ॥

এখানে বিশেষ করিয়া যে-কথাটি লক্ষ্য করিতে হইবে তাহা হইল এই যে, কালিদাসের মতে বাক্য ও অর্থ—কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাববস্তু এবং তাহার প্রকাশরূপ শব্দ—পরস্পর নিত্যসম্বন্ধযুক্ত হইয়া আছে—যেমন নিত্যসম্বন্ধযুক্ত হইয়া আছেন বিশ্ব-সৃষ্টির আদি জনক-জননী পার্বতীপরমেশ্বর। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে, যিনি শিব, তিনি নিরাকার—বিশুদ্ধ চিন্ময়—ভাবমাত্র তনু; এই ভাবতনুকে ভবতনুতে প্রকাশ করেন ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি। এই শক্তিরূপিণী প্রকাশরূপিণী পার্বতীর ভিতর দিয়াই ভাবরূপ মহেশ্বরের সকল রূপলীলা। শিব আপনাতে আপনি ভাবমাত্র—ভাবের ভব-লীলা প্রকাশাত্মিকা মহেশ্বরীর লীলায়। তন্ত্রে দেখিতে পাই, এই শিব এবং শক্তি কেহই পরস্পরনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র নহেন,—শিবাশ্রয় ব্যতীত শক্তির খেলা নাই,—শক্তি ব্যতীত শিবের ভবত্ব বা অস্তিত্বই নাই,—শিব সেখানে শব। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অর্থ বা ভাবরূপ মহেশ্বর এবং শব্দ বা ভব-রঞ্জিনী পার্বতী—উভয়ে পরস্পরের আশ্রিত। উপযুক্ত প্রকাশ ব্যতীত অর্থ অসত্তামাত্র, আর অর্থের ঘনিষ্ঠযোগে যে শব্দের প্রকাশ নয় সে শব্দাড়ম্বর 'অর্থ'হীন বলিয়াই 'নিরর্থক'। শব্দার্থের এই পার্বতী-পরমেশ্বরের ন্যায় যে নিত্য অবিনাবদ্ধভাব ইহাই 'সাহিত্য' কথাটির মৌলিক তাৎপর্য। শব্দার্থের সেই সাহিত্যে বা

অদ্বয়যোগে সহজাত বিশ্বাসই হইল কালিদাসের সকল শিল্প-কলার মূল রহস্য।

শব্দের সহিত পার্বতীর তুলনা—বা শব্দকে আদিতে শক্তিমূল বলিয়া গ্রহণ করিবার এই প্রবণতা ভারতবর্ষীয় চিন্তাধারার মধ্যে নানাভাবে গভীর হইয়া দেখা দিয়াছে; এই শব্দ মূলে হইল 'নাদ'তত্ত্ব—অর্থ হইল 'বিন্দু'তত্ত্ব; শক্তিই নাদ, শিবই বিন্দু। উপ-নিষদাদিতে দেখিতে পাই—ব্রহ্মের দুইটি রূপ—মূর্ত এবং অমূর্ত। এই মূর্ত ব্রহ্ম হইলেন শব্দব্রহ্ম—অমূর্ত ব্রহ্মই অশব্দব্রহ্ম। শব্দ-ব্রহ্মই নাদ, অশব্দব্রহ্মই বিন্দু। ভারতীয় স্ফোটবাদের মতানুসারে, এই শব্দের আবার চারিটি রূপ বা অবস্থা আছে, বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরা। বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উত্থিত বায়ুস্পন্দনরূপে কর্ণে যাহা প্রবেশ করে তাহা শব্দের একান্ত বাহ্যরূপ, ইহাই বৈখরীরূপ। মধ্যমা ইহা হইতে শব্দের সূক্ষ্মতর রূপ। মধ্যমার কোনও বাহিরের রূপ নাই—তাহা 'অন্তঃসন্নিবেশিনী'; একমাত্র বুদ্ধিই হইল ইহার উপাদান—'বুদ্ধিমাত্রোপদানা'; অর্থাৎ বুদ্ধিব্যাপারেই ইহার অস্তিত্ব; ইহা সূক্ষ্মা এবং আমাদের প্রাণবৃত্তিরই অনুগতা; যদিও বুদ্ধি-ব্যাপাররূপে সকল প্রকারের প্রকাশ-ক্রম ইহাতে সংহত হইয়া আছে, তথাপি সকল প্রকাশক্রমের সম্ভাবনাও ইহার ভিতরে নিহিত রহিয়াছে,—উপযুক্ত সময়ে ইহা ক্রমপারম্পর্যের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। পশ্যন্তী অবস্থা আরও সূক্ষ্ম—ইহা অনেকখানি জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের একটা একীভূত অবস্থা। "সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার প্রাক্‌কালে বীজের মধ্যে সমস্ত বৃক্ষোৎপাদনের শক্তি যে-ভাবে বিবিধ ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিবার জন্য প্রস্তুত থাকে অথচ আপনাকে বিভক্ত করিয়া প্রকাশ করে না; ভীষণ ঝড়ের পূর্বে প্রকৃতির অন্তঃস্তব্ধতার মধ্যে যেভাবে তাহার

শক্তিপুঞ্জ আপনাতে লীন থাকে, চিত্তেরও তেমনি একটি অবস্থা আছে যে অবস্থার অর্থাকারে উদ্বোধ হয় নাই, অথচ চিত্তের স্বাভিন্ন স্পন্দনের মধ্যে তাহা বিধৃত হইয়া রহিয়াছে—এই অবস্থাকে বলে পশ্যন্তী।” [১] এই পশ্যন্তীরও পশ্চাতে রহিয়াছে একটি ‘ভাবিচরাচর-বীজরূপিণী’ পরাশক্তি—যাহা হইতে বিশ্বসৃষ্টি উৎসারিত হয় সেই নাদরূপিণী পরাশক্তি। এই পরাশক্তিকে তন্ত্রে বলা হইয়াছে কামেশ্বরী ; জ্ঞানমাত্রতনু শিবের সকল অভীষ্টপূর্তি দ্বারা তাঁহার সকল কামনা পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে সদানন্দে নিমগ্ন রাখেন বলিয়াই তিনি কামেশ্বরী। শিবের অভীষ্টপূর্তি শব্দের তাৎপর্য শিবের সুষ্ঠু প্রকাশ। এই প্রকাশরূপিণী দেবীকে তাই বলা হইয়াছে, শিবের বিমল-আদর্শরূপিণী। কেহ যেমন নিজেকে নিজে আস্বাদ করিতে পারে না,—বিমল মুকুরে আত্মসৌন্দর্য-মাধুর্য সম্যক্ প্রতিফলিত হইলে তাহাকে অবলম্বন করিয়াই যেমন আত্ম-আস্বাদন সম্ভব ; প্রকাশ-রূপিণী শক্তির বিমল আদর্শে আত্ম-প্রতিফলন দর্শন করিয়াই তেমনি হয় শিবের আত্ম-সম্ভোগ। কাব্য ও অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও আমরা দেখিতে পাই সেই একই সত্য। অমূর্ত চিন্তা, তাহা যত সূক্ষ্ম এবং মূল্যবান্ হোক্ না কেন, যতক্ষণ উপযুক্ত রূপের আশ্রয়ে প্রকাশিত না হইয়াছে ততক্ষণ সে অসৎ—সে অনাস্বাদ্য। কুন্তকের ‘বক্রোক্তি-কাব্য-জীবিত’ গ্রন্থের প্রারম্ভে সাহিত্যের তাৎপর্যব্যাখ্যায়ও আমরা ঠিক সেই কথাই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। এইজন্য কুন্তক সাহিত্যের ‘দ্বিতয়’ ধর্মের দুইয়ের উপরেই সমান জোর দিয়া

---

(১) কাব্যবিচার—ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

গিয়াছেন—তাঁহার কথিত তত্ত্ব ও নির্মিতিই হইল কালিদাসের অর্থ ও শব্দ—তাহাই হইল পরমেশ্বর এবং পার্বতী।[১]

আমরা উপরে কাব্যের 'ভাব-রূপ' (Spirit) ও 'ভব-রূপ' (expression) সম্বন্ধে যে আলোচনা করিলাম, সেই সকল আলোচনারই একটি মুখ্য লক্ষ্য রহিয়াছে, সে লক্ষ্যটিকে স্পষ্ট করিয়া বলিলে দাঁড়ায় এই ;—কালিদাসের কাব্যের মধ্যে যত উপমা-প্রয়োগ (অর্থাৎ মোটামুটি ভাবে অলঙ্কার-প্রয়োগ) তাহা কালিদাসের কাব্যের দেহে কোনও সচেতন-আরোপিত গুণ নহে,—তাহা তাঁহার অসাধারণ কাব্য-শৈলীরই সাধারণ ধর্ম। এই দৃষ্টি লইয়া বিচার না করিলে মহাকবি কালিদাসের উপমার যে চমৎকারিত্ব তাহাকে আমরা যথাযথভাবে আস্বাদন করিতে পারিব না।

শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের মূল রহস্য

কালিদাসের উপমাগুলি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্বে অলঙ্কার সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা আলোচনা দ্বারা আমাদের কয়েকটি ধারণা আরও স্পষ্ট করিয়া লওয়া প্রয়োজন। আমরা জানি, অলঙ্কারকে সাধারণভাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে—শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কার।

---

(১) কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে' মহাদেবের নিকট পার্বতীকে প্রদান প্রসঙ্গে কবি মহর্ষি অঙ্গিরার মুখেও বলাইয়াছেন,—

তমর্থমিব ভারত্যা সুতয়া যোক্তুমর্হসি। (৬।৭৯)

'ভারতী বা শব্দের সহিত যেরূপ অর্থের মিলন সংঘটন করা হয়, তোমার কন্যার সহিত তেমনই মহাদেবের মিলন সংঘটন করান উচিত।'

এই দুই জাতীয় অলঙ্কারকে আমরা শব্দের দুইটি সাধারণ ধর্মের সহিত যুক্ত করিয়া লইতে পারি ; একটি হইল শব্দের সঙ্গীত ধর্ম, অপরটি হইল শব্দের চিত্রধর্ম। এখানেও পুনরায় উল্লেখ করিয়া লইতেছি, 'শব্দ'কে এখানে আমি তাহার প্রচলিত সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিতেছি না,—'শব্দ'কে গ্রহণ করিতেছি তাহার ব্যাপক অর্থে—যে অর্থে তাহার প্রকাশরূপতা। অনির্বচনীয় রসানুভূতিকে আভাসিত করিয়া তুলিতে সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্যকারী হইল সঙ্গীত। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, কাব্যের যাহা বাচ্য তাহা সর্বত্রই 'বিশেষ' ; বাচ্যের এই 'বিশেষ'ত্বকে প্রকাশ করিতে ভাষাকেও 'বিশেষ'ত্ব লাভ করিতে হয়। ভাষাকে তাহার ব্যবহারিক সাধারণত্ব অতিক্রম করিয়া অসাধারণ হইয়া উঠিতে অনেকখানি সাহায্য করে এই সঙ্গীত-ধর্ম। কাব্যে এই সঙ্গীত ধর্মের প্রকাশ এক ছন্দে, অন্য শব্দালঙ্কারে। শব্দালঙ্কার যেখানে কবির বাগৈশ্বর্য প্রকাশের একটা সাড়ম্বর চেষ্টা মাত্র সেখানে সে কাব্যদেহে ব্যাধীভূত,—সে ভূষণ নয়—দূষণ। কিন্তু শব্দালঙ্কারের যথার্থ কাজ হইল, শব্দের অর্থকে বিচিত্র ধ্বনি-তরঙ্গের ভিতর দিয়া বিস্তার করিয়া দেওয়া—হৃদয়ের যে অস্ফুট কথা ভাষায় প্রকাশ পায় না তাহাকে আভাসিত করিয়া তোলা। উপযুক্ত ছন্দের সঙ্গে তাই যখন উপযুক্ত শব্দালঙ্কার যুক্ত হয় তখন পরস্পরের সাহচর্যে শব্দশক্তি অনন্ত এবং অপূর্ব বিস্তার লাভ করে। কালিদাসের 'রঘুবংশ'কাব্যে দেখিতে পাই, রামচন্দ্র সীতাকে লইয়া বিমান-পথে লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় ফিরিবার কালে কবি সমুদ্রের বর্ণনা করিতেছেন,—

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমাল-তালী-বনরাজি-নীলা।

আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-
র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা ॥

এখানে শব্দালঙ্কারের যে ঝঙ্কার উঠিয়াছে, তাহাতে সমুদ্রের বর্ণনা সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। 'আ'কারের পর 'আ'কারের দ্বারা সমুদ্রের সীমাহীন বিপুলতাকে যেন ধ্বনির ভিতর দিয়াই মূর্ত করিয়া তোলা হইয়াছে। 'কুমার-সম্ভবে' উমার বর্ণনা করিতে গিয়া কবি বলিলেন,—'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব!' উদ্ভিন্ন যৌবনা উমার লাবণ্যের কমনীয়তা কিছু ছন্দে, কিছু চিত্রে, কিছু ধ্বনির কমনীয়তার ভিতর দিয়া কবিকে ফুটাইয়া তুলিতে হইয়াছে। আবার অভিনন্দ কবি যেখানে মেঘ-বিদ্যুতে ঘনান্ধকারময়ী ভয়ঙ্করী রজনীর বর্ণনা করিতেছেন,—

বিদ্যুদ্দীধিতিভেদভীষণতমঃস্তোমান্তরাঃ সন্তত-
শ্যামাম্ভোধররোধসংকটবিয়দ্বিপ্রোষিতজ্যোতিষঃ।
খদ্যোতানুমিতোপকণ্ঠতরবঃ পুষ্ণন্তি গম্ভীরতাম্
আসারোদকমত্তকীটপটলীক্বাণোত্তরা রাত্রয়ঃ ॥

সেখানে গভীর অন্ধকারময়ী রজনীর ভীষণতা—তাহার ভিতরে ঝড়ের প্রচণ্ডতা যেন শব্দ-ধ্বনির ভিতর দিয়াই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, এখানে শব্দালঙ্কারও শুধু 'কটক-কুণ্ডলাদিবৎ' হইয়া ওঠে নাই, —সাধারণ শব্দ এবং অর্থদ্বারা যাহাকে প্রকাশ করা যায় না, সঙ্গীতের ভিতর দিয়া ঝঙ্কারের ভিতর দিয়া তাহাকে প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রকাশের এই কলা-কৌশলকে চেষ্টা করিয়া আনিতে হয় না,—কবির সচেতনতার ভিতরেও যে সর্বদা তাহার উৎপত্তি

এমন কথাও বলা যায় না; ভোলানাথ রসসত্তার ভিতরেই নিহিত থাকে যে স্পন্দনময়ী প্রকাশ-শক্তি, এ সকল কলা-কৌশল সেই শক্তিরই বিলাস-বিভূতি মাত্র। ভাবের সূক্ষ্মতা এবং অনির্বচনীয়তার ভিতরেই লুক্কায়িত থাকে এই সকল কলা-কৌশলের প্রয়োজনীয়তা; প্রকাশের কালে ভাব তাই আপনিই ইহাদিগকে যোগাড় করিয়া লয়। শব্দালঙ্কার যেখানে ভাবপ্রকাশের এই স্বচ্ছন্দ গতির ভিতরেই অতি স্বাভাবিক নিয়মে জাগিয়া না ওঠে, সেখানেই তাহা একটা কৃত্রিম চাকচিক্য মাত্র হইয়া দাঁড়ায়,—সেখানে তাহাদের প্রয়োজন অপেক্ষা আয়োজন বেশী। কবি জয়দেব যখন,—'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ' প্রভৃতি দ্বারা ঘন-মেঘজালে সমাবৃত নভোমণ্ডল এবং শ্যামল তমালতরুনিকরে অন্ধকার বনভূভাগের বর্ণনা দ্বারা কাব্য আরম্ভ করিলেন, সেখানে তাঁহার শব্দের ঝঙ্কার সার্থক। কিন্তু তিনিই যখন বসন্ত বর্ণনা আরম্ভ করিলেন,—

ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে।
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিলকূজিত-কুঞ্জকুটীরে॥
অথবা, উন্মদ-মদন-মনোরথ-পথিক-বধূজন-জনিত-বিলাপে।
অলিকুল-সঙ্কুল-কুসুম-সমূহ-নিরাকুল-বকুল-কলাপে॥

তখন বেশ বুঝা যায় ইহা ভাবের স্বচ্ছন্দ গতি-প্রসূত নহে, কবির সচেতন চেষ্টার ফল এবং শব্দের ঝঙ্কার এখানে অনেক খানিই যেন 'কটক-কুণ্ডলাদি'র অনাবশ্যক প্রাচুর্যে এবং ঝনৎকারে কাব্যের দেহ ও মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কার লইয়া নিছক একটা অনাবশ্যক চাতুর্য দেখাইবার চেষ্টা সংস্কৃত সাহিত্যে

যে কিছু কম হইয়াছে তাহা নহে,—আমাদের বাঙলা এবং হিন্দী সাহিত্যে হইয়াছে ততোধিক,—শুধু পদ্যে নয়, গদ্যেও। দেহকে স্বাস্থ্যবান্ এবং কর্মঠ করিয়া তুলিবার জন্য শরীর চর্চা করিয়া মাংস-পেশীগুলিকে সুগঠিত করা দরকার; কিন্তু এমন একদল লোকও সংসারে দুর্লভ নহেন যাঁহারা জগতের তেমন আর বিশেষ কোন কাজেই লাগিতেছেন না, শুধু মুগুর ভাঁজিয়া হস্তদ্বয়ের মাংসপেশীর পরিধিই বাড়াইতেছেন, এবং তাহা লইয়া জন-সমাজে নানাবিধ কসরৎ দেখাইয়া বাহবা লইবার চেষ্টা করিতেছেন। কাব্যক্ষেত্রেও এই পালোয়ানী মনোবৃত্তি যে খুব কম তাহা নহে,—কিন্তু যেখানেই লেখক পরিচয় দেন এই পালোয়ানী মনোবৃত্তির সেই খানেই তিনি অকবি,—তাহার রচনাও সেখানে অকাব্য।

আমরা দেখিলাম, শব্দালঙ্কার ভাষার সঙ্গীত-ধর্মের অন্তর্গত; ভাষার চিত্রধর্মে জাগে ভাষার অর্থালঙ্কারগুলি। অবশ্য এই চিত্রধর্ম কথাটি খুব স্পষ্ট নহে,—তাই তাহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন। বাহিরের কোন বস্তু বা ঘটনার স্মৃতিধৃত স্ফুট-অস্ফুট চিত্রকে মনের পটে জাগাইয়া দিয়া তাহার সাহায্যে বক্তব্যকে প্রকাশ করার ধর্মকেই আমি ভাষার চিত্রধর্ম আখ্যা দিয়াছি। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইব, আমরা যাহা কিছু ভাবি বা বুঝি তাহার সবখানি না হইলেও অধিকাংশই বহির্জগতের বস্তু বা ঘটনার অনুকৃতির ছায়ায়। আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণই বহির্জগৎ হইতে অভিজ্ঞতা দ্বারা আমরা লাভ করিয়াছি, না ইহার ভিতরে মনের নিজস্ব সম্পদও অনেক আছে, তাহা লইয়া দার্শনিক এবং মনস্তাত্ত্বিকগণের ভিতরে যথেষ্ট তর্ক-বিতর্ক রহিয়াছে; কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানের ভিতরে মনের নিজস্ব-সম্পদের কথাও স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারাও সাধারণতঃ এই কথাই

বলেন যে, জ্ঞানের মাল-মসলা সকলই সংগৃহীত হয় বহির্জগৎ হইতে। ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা বস্তু সম্বন্ধে যে চিৎ-প্রত্যয় (Concept) লাভ হয় মন তাহার নিজের শক্তিতে তাহার ভিতরে নানাবিধ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লয়। কিন্তু মূলতঃ তাহা হইলে আমাদের জ্ঞান নির্ভর করিতেছে বহির্বস্তু বা ঘটনার অনুভূতির উপরে। আজ হয়ত জ্ঞানের মাল-মসলার ভিতরে বহির্জগতের এই প্রতিচ্ছবিগুলি খুব স্পষ্ট হইয়া আর আমাদের চোখের সম্মুখে দেখা দেয় না, তাহারা হয়ত আত্ম-গোপন করিয়াছে আমাদের অবচেতন লোকে ; তাই আজ হয়ত আমাদের জ্ঞান অনেকখানি শব্দ-জন্য বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করিলেই অবচেতন হইতে ভাষার ভিতরে বহির্বস্তু বা ঘটনার এই প্রতিচ্ছবিগুলি আবার বাহির হইয়া পড়ে। আমাদের মনের যে ভাব (idea) গুলিকে আমরা বস্তু-বিয়োজিত (abstract) বলিয়া মনে করি, তাহারাও সম্পূর্ণ বস্তু-বিয়োজিত কি না সে বিষয়েও ঘোর সন্দেহ আছে, খুঁজিলে হয়ত তাহাদের পশ্চাতেও মনের অবচেতন লোকে কিছু কিছু অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবির সন্ধান মিলিবে।

মোটের উপর আমরা দেখিতে পাই, আমাদের জ্ঞানক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় সম্পূর্ণ না হইলেও অধিকাংশই বহির্বস্তু বা ঘটনার প্রতিচ্ছবিতে। এ জিনিসটি খুব স্পষ্ট হইয়া ওঠে যখনই আমরা আমাদের মানসিক বা আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে যাই ; এ সকল বিষয়ে কথা বলিতে হইলেই আমাদিগকে বহির্জগতের বস্তু বা ঘটনার প্রতিচ্ছবিতে বলিতে হইবে। ভাষার ভিতরে নিহিত এই যে বহির্জগতের প্রতিচ্ছবি, তাহাই ভাষার চিত্রধর্ম। ভাষার এই চিত্রধর্মই বিস্তৃতি লাভ করিয়া সৃষ্টি করে

আখ্যায়িকা এবং রূপক-কাহিনীর; বাক্যের ভিতরে তাহারা সাধারণতঃ পরিচিত অর্থালঙ্কার রূপে; আর শব্দের ভিতরে এই চিত্রধর্ম সাধারণতঃ নাম গ্রহণ করিয়াছে ভাষার সাধু-প্রয়োগ (idiom)। ভাষার ভিতরে এই সাধু-প্রয়োগ বলিয়া যাহা পরিচিত, তাহাদের অধিকাংশকেই বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব তাহারা ভাষার এই চিত্রধর্ম। আমরা এক চেষ্টায় দুই কাজ সাধন করি না, 'এক ঢিলে দুই পাখী মারি', নিজের কাজ নিজে না করিয়া 'আপনার চরকায় তেল দি', আমাদের হঠাৎ বিপদ আসে না, 'অকস্মাৎ বজ্রাঘাত' হয় (অবশ্য বিপদের 'আসা' ক্রিয়ার ভিতরেও চিত্রধর্ম রহিয়াছে), অপদার্থ লোকের স্বরূপ বুঝাই আমরা 'অকাল কুষ্মাণ্ড' বিশেষণের প্রয়োগে; আমরা সাধারণতঃ 'অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি' দিয়া থাকি; আমরা না জানিয়া আন্দাজে কাজ না করিয়া সাধারণতঃ 'অন্ধকারে ঢিল ছুড়ি'; অপাত্রে নিষ্ফল নিবেদন না জানাইয়া 'অরণ্যে রোদন' করি; আমরা মর্ম-পীড়া না দিয়া 'আঁতে ঘা' দি; (মর্ম-পীড়ার ভিতরেও আছে চিত্রধর্ম); আমরা 'আগুন লইয়া খেলি', কাহারো সহিত কাহারো হয়ত 'আদা-কাচকলা' সম্বন্ধ, কেহ হয়ত 'আপনার নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ' করি; 'ইঁচোড়ে পাকিয়া' উঠি; কাহাকে দিয়া 'ইস্তক জুতা সেলাই নাগাদ চণ্ডীপাঠ' সারিয়া লই; 'উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসি', 'উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ' করি, 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাই'; আমরা 'কথায় চিড়া ভিজাইতে' পারি না; 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা' দি; কাহাকেও 'কুপকাৎ' করিয়া ফেলি; 'খাল কাটিয়া কুমীর' আনি; 'গরজের নৌকা ডাঙ্গায়' চালাই; 'ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াই'; মানুষের 'চোখে ধূলা' দিই; কাহারও হয়ত 'জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ'; 'জাগন্ত ঘরে' হয়ত চুরি হইয়া যায়;

বিরল বস্তু আমাদের কাছে 'ডুমুরের ফুল'। 'তিলকে তাল করা', 'তেলে মাথায় তেল দেওয়া', 'তেলে বেগুনে জ্বলিয়া ওঠা', 'দুনৌকায় পা দেওয়া', 'নখদর্পণে রাখা,' 'ছাইয়ে ঘি ঢালা,' 'মাঠে মারা যাওয়া,' 'শিঙ ভাঙ্গিয়া পালে মেশা', 'হালে পানি না পাওয়া'—সর্বত্রই রহিয়াছে এই চিত্র-ধর্ম। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, যেখানেই আমরা বক্তব্যকে সুন্দর করিয়া স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি সেখানেই লইয়াছি চিত্রের সাহায্য। গুণবাচক, ক্রিয়াবাচক বা মানসিক অবস্থাবাচক শব্দগুলিকে আমরা প্রায় সর্বত্র এই চিত্র-ধর্মের সাহায্যে প্রকাশ করিয়া থাকি। আমাদের বিপদ 'আসে', অথবা আমাদের মস্তকে বিপদ 'পাত হয়',—অথবা আমরা বিপদে 'পড়িয়া যাই'; ইহার সর্বত্রই বিপদকে আমরা বাহিরের বস্তুর প্রতিচ্ছবিতে গ্রহণ করিয়াছি। আমরা আনন্দে 'আপ্লুত' হই, দুঃখে 'নিমজ্জিত' হই, আহ্লাদে 'আটখানা' হই, বিষাদে মন 'ভাঙিয়া পড়ে',—আনন্দে 'উৎফুল্ল' হই, নিরাশায় 'হাল ছাড়িয়া দি',—ক্রোধে গা জ্বলে, মিষ্টি কথায় শরীর 'জুড়াইয়া' যায়। ইহার প্রত্যেকটি কথাকে বিচার বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব, আমরা এসকল কথা অন্য কোনওরূপে প্রকাশ করিতে পারি না।। মানুষের আনন্দে ভরিয়া যাওয়া মনে এমন একটা আপ্লাবন আছে,—দুঃখের ভিতরে চিত্তবৃত্তির এমন একটা নিমজ্জন আছে,—আহ্লাদে এমন একটা খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবার ভাব আছে,—আনন্দে এমন কুসুম-সম একটা বিকাশ আছে যে, কোনটাকেই আমরা চিত্র ব্যতীত অন্য বিশেষণের সাহায্যে বুঝাইতে পারি না। এই 'প্লাবনে'র কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম; আনন্দে যে হৃদয় 'ভরিয়া' যায় তাহাকেই বা অন্য কিরূপে আমরা প্রকাশ করিতে পারি? এক 'ভরিয়া যাওয়া' ক্রিয়াটির

ভিতরে রহিয়াছে দুই দিকের দুইটি চিত্র,—একটি হৃদয়ের একটা পাত্র-চিত্র, অন্যটি আনন্দের একটি তরল প্রবাহচিত্র। আমাদের মন যখন বিপদের সম্মুখীন হয় তখন এই 'সম্মুখীন হওয়া' ক্রিয়াটি বহন করে দুই পাশের সঙ্গীনধারী মন ও বিপদের ভিতরে উভয়তঃই একটা 'সাজ সাজ' ভাব। তারপরে আমরা কেহ চলি 'গজ গমনে,' কাহারও 'অশ্বগতি', কাহারও 'মাটির শরীর', কাহারও 'শ্যেনদৃষ্টি'। 'শ্যেনদৃষ্টি' না বলিয়া যদি 'তীক্ষ্ণ' দৃষ্টি বলি তাহাতেও যে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম এমন নহে; দৃষ্টি তাহার 'তীক্ষ্ণতা' লাভ করিয়াছে কাহার অনুকরণে? কোনও কিছুর উপরে আমরা দৃষ্টি 'নিক্ষেপ' করি,—কাহারও কাহারও কথায় হয়ত কর্ণ 'পাত' করি না, 'দুরূহ' কাজে আমাদের মন 'বসে'না। আদরে আমরা 'গলিয়া পড়ি', সম্পদে মুখে হাসি 'ফোটে', বিপদে সাহস 'হারাই', কাঁদিয়া একেবারে 'ভাসাইয়া' না দিয়া যদি আমরা শুধু কাঁদিয়া 'ফেলি' চিত্রকে সেখানেও মুছিয়া ফেলিতে পারি না। হৃদয়ে আমরা আশা 'পোষণ' করি, আবার নিরাশার 'আঘাত' 'খাই'। নিরাশা যে শুধু আঘাত দিয়া ক্ষান্ত হয় তাহা নহে,—সে আঘাতকে আমাদের আবার 'খাইতে' হয়। আমাদের ভিতরে সকলেই যে 'সোজা' মানুষ এমন নহে, অনেকের আবার 'বাঁকা' মন, বাঁকা না বলিয়া 'কুটিল' বলিলেও মনের বক্র গতিকে ঢাকা যাইবে না। আমাদের ভিতরে আবার 'ছোট মন', 'বড় মন' আছে, মনের 'সঙ্কীর্ণতা' আছে, 'উদারতা' বা 'বিশালতা' আছে; তাহার ভিতরে 'নীচু'ও আছে, 'উঁচু'ও আছে। আমরা 'ছোট' কথা বলি, 'লম্বা' কথাও বলি;—'নরম' কথাও বলি 'গরম' কথাও বলি। কাজ করিয়া 'ফল' লাভ করা ছাড়া আমাদের গতি নাই। 'বিপ্লব' কথাটির প্রাথমিক অর্থটি আমরা প্রায় ভুলিতে

বসিয়াছি। কিন্তু আমাদের ভুলও 'ভাঙে'। অল্পে আজকাল আমাদের মন 'বিষাইয়া' যাইতেছে,—আমরা আধুনিক সাহিত্যিকেরা আবার একেবারে 'মরিয়া' (মরীয়া ?) হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছি। উদাহরণ আর বাড়াইয়া লাভ নাই। এক কথায় বলিতে গেলে, অন্তর্লোকের কোন জাতীয় সংবাদকে বাহিরে প্রকাশ করিতে হইলেই তাহাকে বাহিরের সাজে সাজিয়াই বাহির হইতে হইবে। এমন কি দৈহিক অনুভূতিগুলিকেও আমরা অনেক সময়ই বহির্বস্তু বা ক্রিয়ার অনুকৃতি ব্যতীত প্রকাশ করিতে পারি না। 'মাথা ধরা' রূপ যে আমাদের একটি শারীরিক বিকৃতি আছে তাহাকে আজ পর্যন্ত 'ধরা'র অনুকৃতি ব্যতীত আর অন্য কোন রূপেই প্রকাশ করা গেল না। মাথা 'কন্ কন্' করা, 'ঝিম্ ঝিম্' করা, 'বোঁ বোঁ' করা, চোখ 'জ্বালা' করা, হাত পা 'কামড়ান', মাজা 'টন্ টন্' করা প্রভৃতি স্থূল দৈহিক অনুভূতিগুলিরও অনুকার ছাড়া রূপ মিলিল না। চোখ 'কট্‌মট্' করা, লাল 'টুক্‌টুক্' করা, সাদা 'ধব্ ধব্' করা প্রভৃতির ভিতরকার প্রচ্ছন্ন চিত্রের ইতিহাসটিও অনেকের চোখ এড়াইতে পারে নাই।

আধ্যাত্মিক জগতের কোন কথাই যে আমরা জাগতিক বস্তু বা ঘটনার সাহায্য ব্যতীত বলিতে পারি না তাহার প্রথম প্রমাণ এই যে আধ্যাত্মিক শব্দটির সহিত প্রারম্ভেই আমি 'জগৎ' কথাটি যোগ না করিয়া কথা বলিতে পারি নাই। ভগবান বলিতে দার্শনিক-গণ বা যোগিগণের মনের মধ্যে কি চিন্তা হয় জানি না, কিন্তু আমাদের সাধারণ লোকের মনে যতই অস্পষ্ট হউক না কেন আমাদেরই ন্যায় একটি হস্তপদ-বিশিষ্ট জীবের আকৃতি-প্রকৃতি চিন্তার পটভূমিতে জাগিয়া উঠে। প্রাচীন যত ধর্মগ্রন্থ রহিয়াছে সেখানে রূপক ব্যতীত ধর্মালোচনা কোথাও জমিয়া উঠে নাই। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ যাহাই হৌন, মানুষ তাঁহার

সহিত নিজেদের যত রকম সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, সকলেই মানবীয় প্রেমের উপমা লইয়া। এ জিনিসটির চরম পরিণতি আমরা দেখিতে পাই বৈষ্ণব শাস্ত্রে এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে।

মোটের উপরে দেখিতে পাইতেছি, চিত্র যে কাব্যের ভূষণ-স্বরূপ তাহা নহে,—চিত্র ব্যতীত আমাদের ভাষাই হয় না,—আমরা মনের ভাবই ব্যক্ত করিতে পারি না। সঙ্গীত এবং চিত্রের ভিতর দিয়া আমাদের ভাষা একেবারে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইয়া ওঠে; তখন সেই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ভাষার ভিতর দিয়া মনের জগৎকে আমরা পাই প্রত্যক্ষ করিয়া,—ভাষার মারফতে এই প্রত্যক্ষ অনুভূতির ভিতর দিয়াই একটি অন্তরের রস-সম্ভার সংক্রামিত হয় অন্য চিত্তে।

কালিদাসের সালঙ্কার ভাষা যথার্থ কাব্যের ভাষা

তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইলাম, কাব্যের শব্দালঙ্কার বা অর্থালঙ্কার কিছুই কাব্যের ভূষণ মাত্র নহে। কবির মনের রস-প্রেরণাকে বাহিরে প্রকাশ করিতে হইলে ভাষার ভিতরে নিরন্তরই অলঙ্কারের প্রয়োজন হয়। বস্তুতপক্ষে আমাদের শব্দের অর্থ এত-খানি তাহার ধ্বনি ও চিত্র-সম্পদের উপরে নির্ভর করে যে এই সকল সঙ্গীত, ধ্বনি-মাধুর্য, চিত্র-সম্পদ বাদ দিয়া শব্দের, একটি নিরেপেক্ষ অর্থ খুঁজিয়া বাহির করা অনেক সময়ে শক্ত।

'রঘুবংশে'র দ্বিতীয় সর্গে দেখিতে পাই রাজা দিলীপ সমস্ত দিন বনে বনে বশিষ্ঠের ধেনু নন্দিনীকে চরাইয়া সন্ধ্যায় আশ্রমে ফিরিয়া আসিতেছেন,—তখন রাণী সুদক্ষিণা—

> পপৌ নিমেষালস-পক্ষ্ম-পংক্তি-
> রুপোষিতাভ্যামিব লোচনাভ্যাম্॥ (২।১৯)



পলক-বিহীন ভাবে উপোষিত নয়নদ্বয়ের দ্বারা রাজাকে পান করিতে-ছিলেন। রাজার সহিত মুনির আশ্রমে রাণীও ব্রতচারিণী; সমস্ত দিন রাজা বনে নন্দিনীর পরিচর্যা করিয়াছেন,—ব্রতচারিণী রাণীও রাজার অদর্শনে সমস্ত দিনে আর কোন রূপই গ্রহণ করেন নাই,—তাই সমস্ত দিনে রাণীর নয়ন দু'টি উপবাস ক্লিষ্ট এবং তৃষ্ণার্ত। রাজা যখন দিনান্তে ফিরিয়া আসিতেছিলেন তখন সুদক্ষিণার সেই উপবাসক্লিষ্ট নয়নদ্বয় তৃষ্ণার্তের মত অপলকে সেইরূপ পান করিতে-ছিল। রাণীর দর্শনাকাঙ্ক্ষার সমগ্র তীব্রতা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে এই একটি মাত্র উৎপ্রেক্ষার ভিতরে। উপোষিত নয়নের দ্বারা রাণী রাজাকে শুধু দেখিলেন না,—'পপৌ',—যেন পান করিতে লাগিলেন। এখানে রাণীর এই তীব্র ব্যাকুল দর্শন-ইচ্ছাকে প্রকাশ করিবার আর ভাষা নাই। কবিকে সাদাসিধা ভাবে বলিতে হইলে হয়ত তিনি বলিতেন,—রাণী সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু এই 'সতৃষ্ণ' কথাটি কি? ঐ পূর্বের উপমাটিই রহিয়াছে এই একটি কথার ভিতরে বীজাকারে।

কবি কালিদাসের সমগ্র কাব্য পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি তাঁহার দুই চোখ ভরিয়া পৃথিবীর যেখানে যাহা কিছু রূপ আছে তাহাকে ব্যাকুল আগ্রহে শুধু পান করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য চোখের দ্বারা রূপের পান—ইহা কালিদাসের একটি প্রিয় বচনভঙ্গি। 'মেঘদূতে'র পূর্বমেঘে দেখিতে পাই, যক্ষ বলিতেছে,—

ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ
প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ। (১৬)

ধরণীর রুক্ষদেহে শ্যামশস্যের শোভাবিস্তার করাইবে যে নবীন মেঘ তাহার সেই সজল শ্যামকান্তিকে জনপদবধূগণ ভ্রূবিলাসে অনভিজ্ঞ

প্রীতিস্নিগ্ধ লোচন সমূহের দ্বারা আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া শুধু পান করিতে থাকিবে। এইরূপে জনপদবধূগণের প্রীতিস্নিগ্ধ লোচনের দ্বারা পীয়মান হওয়া—ইহা নবীন মেঘের পক্ষে পরম লোভ ত বটেই!

'রঘুবংশে'ও দেখিতে পাই, রামচন্দ্র সীতাকে লইয়া বিমানে চড়িয়া লঙ্কা হইতে যখন ফিরিয়া আসিতেছেন তখন দূর হইতে উপকূলের শোভা দেখিয়া বলিয়াছেন,—

উপান্তবানীরবনোপগূঢ়া-
ন্যালক্ষ্যপারিপ্লব-সারসানি।
দূরাবতীর্ণা পিবতীব খেদা-
দমূনি পম্পাসলিলানি দৃষ্টিঃ ॥ (১৩।৩০)

দূর হইতে দেখা যাইতেছে পম্পা-সরোবর, কূলে কূলে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে বেতসবন; সেই বেতসবনের ফাঁকে ফাঁকে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে চঞ্চল সারসগুলিকে; এমন পম্পা-সরোবরের নিথর কালো জলকে শ্রান্ত রামচন্দ্র অঞ্জলি ভরিয়া পান করিলেন না—বেশি তৃপ্ত হইতে লাগিলেন যেন দুই চোখ ভরিয়া পান করিয়া।

'কুমার-সম্ভবে' দেখিতে পাই, মদনের বাণে যোগস্থ শিবের ধ্যান ভাঙিয়া গিয়াছে, মুহূর্তের জন্য যোগীশ্বর শিবের প্রশান্ত চিত্তে ঈষৎ চাঞ্চল্য আসিল। সে চাঞ্চল্যকে কালিদাস প্রকাশ করিলেন কি ভাষায়?—

হরস্তু কিঞ্চিৎপরিলুপ্তধৈর্য-
শ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে
ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি ॥ (৩।৬৭)

'চন্দ্রোদয়ের আরম্ভে জলরাশির ন্যায় কিঞ্চিৎপরিলুপ্তধৈর্য হইয়া

মহাদেবও উমার বিম্বফলের ন্যায় অধর-ওষ্ঠের দিকে তাঁহার দৃষ্টিপাত করিলেন।' যোগীশ্বর দেবাদিদেব মহাদেবের যোগমগ্ন প্রশান্ত চিত্তের কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যকে ইহা অপেক্ষা আর সুন্দর করিয়া বলা যায় না। শিবের ধ্যান-সমাহিত প্রশান্ত চিত্তের ঈষৎ ধৈর্যচ্যুতি যেন চন্দ্রোদয়ের আরম্ভে বিরাট বারিধিবক্ষের ঈষৎ উদ্বেলতা! কবিকে কত সাবধানতা কত নৈপুণ্যসহকারে—কত সূক্ষ্মভাবে শিবের এই চিত্ত-বিক্ষোভকে ভাষা দিতে হইয়াছে। চন্দ্রের উদয়ও এখন পর্যন্ত হয় নাই,—উদয়ের আরম্ভক্ষণে বিরাট অম্বুরাশির ভিতরে যে ঈষৎ চাঞ্চল্য, তাহা দ্বারাই শুধু শিবের চিত্ত-চাঞ্চল্যের একটা আভাস দেওয়া যাইতে পারে। এই যে মহেশ্বরের ঈষৎ চিত্ত-চাঞ্চল্যের সহিত চন্দ্রোদয়ের প্রারম্ভে বিশাল জলরাশির ঈষৎ আন্দোলনের তুলনা, ইহা কাব্যের কোন বেশভূষার পারিপাট্য মাত্র নহে,—এই চিত্র ব্যতীত ভাষা তাহার অর্থকেই প্রকাশ করিতে পারিত না। আমরা যাহাকে কাব্যে ভাষার সৌন্দর্য বলি, তাহা সত্য সত্য ভাষার সার্থকতা; অর্থাৎ রসানুভূতির সমগ্রতাকে বর্ণে, চিত্রে, সঙ্গীতে যে ভাষা যত মূর্ত করিয়া তুলিতে পারিবে, সেই ভাষাই ততখানি সুন্দর এবং মধুর।

অন্য একটি উপমায় কালিদাস বিবাহরাত্রে শুক্লপট্টবস্ত্র পরিহিত মহাদেবকে শুভ্র-ফেনপুঞ্জশোভিত সমুদ্রের সহিত এবং নববধূ উমাকে তটভূমির সহিত উপমা দিয়াছেন। অচিরোদিত চন্দ্রকিরণ সফেন সমুদ্রকে যেমন করিয়া তটভূমির কাছে আগাইয়া দেয়, বরবেশী মহাদেবকে পরিচারকগণ তেমন করিয়াই উমার কাছে আগাইয়া দিয়াছিল।

দুকূলবাসাঃ স বধূসমীপং
নিন্যে বিনীতৈরবরোধদক্ষৈঃ।

বেলাসকাশং স্ফুটফেনরাজি-
র্নবৈরুদন্বানিব চন্দ্রপাদৈঃ ॥ (৭।৭৩)

মহাদেব সম্বন্ধে কালিদাস যখনই কোনও উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন, সর্বদাই অতি সাবধানে সে কাজ করিয়াছেন; দেবাদিদেবের লোকোত্তর মহিমা যাহাতে কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ণ না হয়, বরঞ্চ বাচ্যে ও ব্যঞ্জনায় যাহাতে সে মহিমা অনন্তপ্রসার ব্যাপ্তি লাভ করে কবি তাহারই চেষ্টা করিয়াছেন। পার্বত্য বনভূমিতে অকাল-বসন্তের সমাগমে যে চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল তাহার ভিতরেও দেবদারুবেষ্টিত বেদিকার উপরে ব্যাঘ্রচর্ম বিছাইয়া দিয়া যোগেশ্বর মহাদেব ধ্যানস্থ রহিয়াছিলেন। লতাগৃহদ্বারদেশস্থ নন্দী বামহস্তে কনকবেত্র ধারণ করিয়া মুখার্পিত অঙ্গুলি দ্বারা সঙ্কেত করিয়া প্রমথগণকে চপলতা প্রকাশ করিতে বারণ করিতেছিলেন; আর নন্দীর সেই শাসনে তরুসকল নিষ্কম্প, অলিকুল নিশ্চল, পক্ষিগণ নীরব হইল; মৃগগণও ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া শান্তভাব অবলম্বন করিল; এইভাবে সমস্ত বনই যেন চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়াছিল। বাহিরে বসন্ত ও মদন—মূর্তিমান চাঞ্চল্য—যোগভূমিতে অপূর্ব স্তব্ধতা; এই পরিবেশের মধ্যে যোগস্থ মহাদেবের চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া কালিদাস বলিলেন,—

অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহ-
মপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধা-
ন্নিবাত-নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥ (৩।৪৮)

যোগেশ্বর মহাদেব অন্তশ্চর বায়ুসমূহকে সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ করিয়া পর্যাঙ্কবন্ধনে স্থির অচঞ্চলভাবে বসিয়া আছেন,—যেন কথানি

অবৃষ্টিসংরম্ভ অম্বুবাহ, যেন অনুত্তরঙ্গ জলধি, যেন নিবাত নিষ্কম্প একটি প্রদীপ! একটু লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, বর্ষণহীন মেঘ বলিতে গিয়া কালিদাস মেঘবাচী অন্য কোনও শব্দ ব্যবহার না করিয়া 'অম্বুবাহ' কথাটি ব্যবহার করিলেন; যে মেঘ অম্বুকেই বহন করে এবং যে কোনও মুহূর্তে বর্ষণ করিতে পারে সেই জাতীয় একখানি জলভরা মেঘ যেন বর্ষণ সংহরণ করিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে; 'অপামিবাধারম্' কথাটির ব্যঞ্জনাও সেইদিকেই—যে সমুদ্র চঞ্চল জলরাশিরই আধার—সে যেন অনুত্তরঙ্গ হইয়া অচঞ্চল হইয়া আছে। যোগেশ্বরের যোগসমাধিকে বর্ণনা করিতে হইলে এমন করিয়াই বর্ণনা করিতে হয়; সেই জন্যই কালিদাসের ভাষা এতটুকু এদিক-ওদিক করিলেই বাচকত্বের হানি ঘটে।

কালিদাস তাঁহার উপমার ব্যঞ্জনায় যে দেবতার মহিমাকেই অনন্ত ব্যাপ্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা নহে, মানুষকেও তিনি এই কৌশলে অনন্ত মহিমা দান করিয়াছেন। 'রঘুবংশে' দেখিতে পাই কালিদাস গর্ভিণী রাণী সুদক্ষিণার বর্ণনা করিতেছেন,—

শরীরসাদাদসমগ্রভূষণা
মুখেন সালক্ষ্যত লোধ্রপাণ্ডুনা।
তনুপ্রকাশেন বিচেয়তারকা
প্রভাতকল্পা শশিনেব শর্বরী ॥ (৩।২)

রাণীর দেহ কিঞ্চিৎ কৃশ হইয়া গিয়াছে,—তাই আর সমগ্র ভূষণ দেহে রাখিতে পারিতেছে না,—মুখখানিও লোধ্রকুসুমের ন্যায় পাণ্ডুতা অবলম্বন করিয়াছে; এইরূপ রাণীকে দেখিয়া মনে হইতেছে,—যেন অল্প-প্রকাশিত চন্দ্রমা সহ লুপ্ততারকা প্রভাতকল্পা যামিনী! একটি উপমা দ্বারা কালিদাস রঘুরূপ পুত্রের জননী

সুদক্ষিণার রূপের যে মাধুর্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সাধারণ ভাষায় কখনও প্রকাশ করা যায় না। উপমাটির প্রত্যেকটি পদ সার্থক। প্রথমতঃ রাণী সুদক্ষিণা এমন একটি পুত্র প্রসব করিতে যাইতেছেন, যাহার নামে একটা রাজবংশ চিরকালের জন্য পরিচিত হইয়া থাকিবে; সেই গর্ভিণী মাতা যেন প্রভাতকল্পা শর্বরী। সূর্যরূপ পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়া আসন্ন-প্রসবা বিরাট রজনীর যে মহিমময়ী মূর্তি, সুদক্ষিণার মূর্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে সেই আসন্ন-মাতৃত্বের গৌরব,—গর্ভে তাহার রাজপুত্র রঘু। সেই আসন্ন-প্রসবা সুদক্ষিণার অঙ্গ হইতে যখন তাঁহার বিবিধ হীরকখচিত অলঙ্কাররাশি খসিয়া পড়িয়াছে, তখন মনে হইল যেন প্রভাতকল্পা শর্বরীর দেহ হইতে তাহার অসংখ্য নক্ষত্রের অলঙ্কার খসিয়া পড়িয়াছে; আর সুদক্ষিণার লোধ্র পাণ্ডুর মুখখানি যেন ঈষৎ-দীপ্ত শেষ রজনীর চন্দ্রমা।

'রঘুবংশে'র সপ্তম সর্গে দেখিতে পাই,—বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত রাজন্যবর্গ ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভায় তাহার মাল্য প্রার্থনায় উৎসুক হইয়া বসিয়া আছেন। বিদ্যুৎ যেরূপ সহস্র সহস্র মেঘখণ্ডে সহস্র সহস্র ভাগে বিভক্ত হইয়া দুর্নিরীক্ষ্যভাবে শোভা পায়, শ্রীও সেইরূপ রাজপরম্পরায় বিভক্ত হইয়া দুর্নিরীক্ষ্যভাবে বিশেষ বিশেষ রাজন্যে বিশেষ বিশেষ প্রভা বিস্তার করিয়া প্রকাশ পাইতেছিল।

তাসু শ্রিয়া রাজপরম্পরাসু
প্রভাবিশেষোদয়দুর্নিরীক্ষ্য।
সহস্রধাত্মা ব্যরুচদ্বিভক্তঃ
পয়োমুচাং পঙ্‌ক্তিষু বিদ্যুতেব॥ (৭।৫)

এই রাজন্যবর্গের সম্মুখে রাজকন্যা ইন্দুমতী মাল্যহস্তে উপস্থিতা। রাজকন্যা মাল্যহস্তে এক এক নৃপতির সম্মুখে যাইতেই সেই সেই

নৃপতির মুখ আশায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে ; কিন্তু ইন্দুমতী অন্য রাজার সম্মুখে চলিয়া যাইতেই প্রত্যাখ্যাত নৃপতি যেন বিষাদের অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে। নৃপতিগণের এই আশা-সঞ্জীবনী এবং বিষাদকারিণী ইন্দুমতীকে কবি বলিলেন একটি সঞ্চারিণী দীপ-শিখা।

সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ
যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা।
নরেন্দ্রমার্গাট্ট ইব প্রপেদে
বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ॥ (৬।৬৭)

অন্ধকার রাত্রে একটি সঞ্চারিণী দীপশিখার ন্যায় রাজকুমারী ইন্দুমতী এক এক করিয়া রাজপথবর্তী সৌধ-সমূহের ন্যায় আসীন রাজন্যবর্গের সম্মুখ দিয়া ফিরিতেছিল। প্রদীপটি যে অট্টালিকার সম্মুখে আসে, সেই অট্টালিকা যেমন ক্ষণিকের জন্য আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে, ইন্দুমতী যে রাজার সম্মুখে যায়, মুহূর্তের জন্য সে রাজাও তেমনি আশার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠেন, দীপশিখার ন্যায় ইন্দুমতী সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইতেই পশ্চাতের নৃপতি বিবর্ণভাব ধারণ করেন।

যেইখানেই মানুষের ভাবের ভিতরে রহিয়াছে একটু সূক্ষ্ম রমণীয়তা, একটু অসাধারণ মাধুর্য, সেইখানেই আমাদের সাধারণ ভাষা তাহার অক্ষমতা লইয়া নীরবে পশ্চাতে সরিয়া যায়, তাহার স্থানে নূতন ভাষা আবার নূতন দ্যোতনা লইয়া আসে নানা চিত্র ও সঙ্গীতের ভিতর দিয়া। 'রঘুবংশে'র সপ্তম সর্গেই দেখিতে পাই, প্রবল পরাক্রান্ত রাজকুমার অজ তাহার অসামান্য রূপে রাজকুমারী ইন্দুমতীর হৃদয় জয় করিয়াছে, এবং তাহার পৌরুষবীর্যে সকল প্রতিদ্বন্দ্বী ঈর্ষ্যাপরায়ণ

রাজকুমারগণকে পরাস্ত করিয়া আসিয়াছে। রাজন্যবর্গকে পরাস্ত করিয়া রাজকুমার যখন ইন্দুমতীর নিকট বিজয়গর্বে ফিরিয়া আসিয়াছে, রাজকুমারী মনে মনে খুব হৃষ্টা হইলেও কুমারীজন-সুলভ লজ্জা ও সঙ্কোচে আপনি আসিয়া সাক্ষাৎ-বচনে কুমারকে অভিনন্দিত করিতে পারিল না,—সখীগণের বাক্য দ্বারা সে রাজকুমারকে তাহার সাদর অভিনন্দন জানাইল।—

হৃষ্টাপি সা হ্রী-বিজিতা ন সাক্ষাদ্
বাগ্‌ভিঃ সখীনাং প্রিয়মভ্যনন্দৎ।

কালিদাস এইখানেই থামিলেন না। কুমারী-হৃদয়ের গর্বমিশ্রিত প্রথম হর্ষকে লজ্জা-সঙ্কোচের ভিতর দিয়া চাপিয়া রাখার ভিতরে যে একটা ভাষাতীত মাধুর্য রহিয়াছে তাহা আর বর্ণনার ভিতরে সবটুকু স্পষ্ট হইয়া উঠিল না,—তখনই আসিল উপমা।—

স্থলী নবাম্ভঃপৃষতাভিবৃষ্টা
ময়ূরকেকাভিরিবাভ্রবৃন্দম্॥ (৭।৬৯)

যেমন করিয়া নব বারিধারা-পাতে অভিষিক্ত বনস্থলী আপনার মুখে প্রিয়তম নব জলধরকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইতে পারে না—ময়ূরের কেকাধ্বনি দ্বারা সে প্রিয়তমের নিকটে তাহার ব্রীড়াকুণ্ঠিত প্রথম প্রেমের অভিবাদন জানায়।

'কুমারসম্ভবে'ও দেখিতে পাই,—

তয়া ব্যাহৃতসন্দেশা সা বভৌ নিভৃতা প্রিয়ে।
চূতযষ্টিরিবাভ্যাসে মধৌ পরভৃতোন্মুখী॥ (৬।২)

পার্বতী শিবের নিকট নিজে বিবাহের কথা বলিতে পারিলেন না, সম্মুখে থাকিয়াও সে-কথা বলাইলেন সখীগণ দ্বারা—যেমন বসন্তানুরক্তা

সহকারশাখা সম্মুখে বসন্তকে উপস্থিত দেখিয়াও নিজে তাহাকে সম্ভাষণ জানাইতে পারে না, সে তাহার সম্ভাষণ জানায় কোকিলের মুখে।

'রঘুবংশে'র অষ্টমসর্গে দেখিতে পাই, রাজকুমার অজকে রাজ্যভার বহনের উপযুক্ত দেখিয়া রাজা রঘু আত্মনির্ভরশীল এবং প্রজামণ্ডলে পরাক্রমশীল কুমারের হাতে রাজলক্ষ্মী সমর্পণ করিয়া নিজে সন্ন্যাস অবলম্বন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু সাশ্রুনয়ন পুত্রের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া রাজ্য একেবারে ত্যাগ করিতেও পারিলেন না। রঘু তখন যতি-আশ্রম গ্রহণ করিয়া রাজনগরীর উপকণ্ঠে বাস করিতে লাগিলেন এবং অবিকৃতেন্দ্রিয় ভাবে পুত্রভোগ্যা রাজলক্ষ্মী কর্তৃক সেবিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু এই পুত্রভোগ্যা রাজলক্ষ্মী দ্বারা সেবিত হইবার ভিতরে একটা সূক্ষ্ম চারুতা রহিয়াছে। পরিণত বয়সে পুত্রার্জিত ধনের দ্বারা সেবিত হইবার ভিতরে যে একটা কমনীয় মাধুর্য, তাহাকে কবি প্রকাশ করিলেন একটি উৎপ্রেক্ষায়,—

> স কিলাশ্রমমন্ত্যমাশ্রিতো
> নিবসন্নাবসথে পুরাদ্বহিঃ।
> সমুপাস্যত পুত্রভোগ্যয়া
> স্নুষয়েবাবিকৃতেন্দ্রিয়ঃ শ্রিয়া॥ (৮।১৪)

পুত্রভোগ্যা রাজলক্ষ্মীর সেবা অবিকৃতেন্দ্রিয় রঘুর নিকটে মনে হইতেছিল আপনার পুত্রবধূরই সেবার ন্যায়!

রাজা দশরথ যখন বৃদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তাঁহার দুই কানের কাছের চুলগুলি পাকিয়া উঠিল; কালিদাস বর্ণনা করিতেছেন, ইহাত ঠিক চুল পাকা নয়, কৈকেয়ীর আশঙ্কায় জরাই যেন পলিতের ছদ্মবেশে রাজার

কর্ণমূলে আসিয়া বলিয়া গেল,—'এইবারে রামচন্দ্রকে রাজ্যলক্ষ্মী প্রদান কর'।

তং কর্ণমূলমাগত্য রামে শ্রীর্ন্যস্যতামিতি।
কৈকেয়ীশঙ্কয়েবাহ পলিতচ্ছদ্মনা জরা॥ (১২।২)

আমরা দেখিলাম, কাব্যের ভিতরে উপমাদি অলঙ্কার বাহুল্য ত নয়ই, কাব্যের আস্বাদনে তাহাদের স্থান গৌণও নয়, বেশ মুখ্য। কিন্তু এই উপমাদি অলঙ্কার আমাদের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম গভীর ভাবগুলিকে ভাষায় প্রকাশ করিতে সাহায্য করে কি প্রকারে? এ কথাটির আলোচনা করিতে হইলে কাব্য সম্বন্ধে গোটা কয়েক মৌলিক কথারই একটু আলোচনা হওয়া দরকার।

উপমার মূলরহস্য—বাসনালোক

বাহিরে যে কাব্য-লক্ষ্মীকে আমরা দেখিতে পাই শব্দে, ছন্দে, ধ্বনি-মাধুর্যে, নানাবিধ কলা-কৌশলের ভিতরে, সেই কাব্য-লক্ষ্মী আমাদের অন্তর্লোক জুড়িয়া আছে তাহার বাসনারূপিণী মূর্তিতে। সুদীর্ঘ জীবনের প্রতিটি নগণ্য মুহূর্তে—জন্মজন্মান্তরের প্রতি পলে পলে বিশ্বসৃষ্টির ভিতরে যেখানে লাভ করিয়াছি যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু রমণীয়, যাহা কিছু বরণীয়, যাহা কিছু প্রেয়, যাহা কিছু শ্রেয়—তাহার কিছুই হারাইয়া যায় নাই, ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া অন্তর্লোকে প্রবেশ করিয়া তাহারা সৃষ্টি করিতেছে একটি বাসনা-লোক। জগতের যেখানে যাহা কিছু সুন্দর, মধুর, আমাদের মন তাহাকে তিল তিল করিয়া সংগ্রহ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে এই

তিলোত্তমা-সুন্দরীকে। বাহিরে আবার যখন কোনো শুভ মুহূর্তে পায় সেই সুন্দরের দেখা,—অন্তরে স্পন্দিত হইয়া উঠে বাসনা-সুন্দরীর সুকুমার বক্ষ,—সেই বাসনার উদ্রেকে খুলিয়া যায় হৃদয়ে রসের উৎস—তাহারই প্রবাহে জাগে ভাব-সম্বেগ,—তাহারই বহিঃপ্রকাশ কাব্য। জীবনের পথে চলিতে চলিতে কখনো হয়ত দিগন্তবিস্তৃত শ্যামল মাঠ দেখিয়া নিবিড় আনন্দ লাভ করিয়াছি,—কোন দিন হয়ত সমুদ্রের সীমাহীন প্রশান্ত বক্ষ দেখিয়া সেই সমজাতীয় আনন্দ লাভ করিয়াছি,—আবার হয়ত স্তব্ধ দুপুরের মাঝে সীমাহীন নীলাকাশের নির্মল বিস্তারের ভিতরে পাইয়াছি সেই একই জাতীয় আনন্দ। কে বলিতে পারে জ্যোৎস্না-নিশীথে প্রেয়সীর সুকুমার বক্ষের স্পর্শ-সুখের নিঃসীমতার ভিতরে ছিল না সেই দিগন্তবিস্তৃত শ্যামল শস্য ক্ষেত্র,—সেই প্রশান্ত সাগরবক্ষ,—সেই সীমাহীন নীলাকাশের অনুভূতির নিঃসীম নিবিড়তা? চন্দ্র-তপনহীন ম্লান আকাশের গায়ে বর্ষার জলভরা মেঘের যে ছলোছলো ব্যাকুলতা দেখিয়াছি, বেত্রবনের কোল ঘেঁসিয়া ছলোছলো বহিয়া যাওয়া ঈষৎ-বঙ্কিম কালোনদীর যে ব্যাকুলতা দেখিয়াছি, আবার বিষাদ-মলিন প্রিয়ার মেঘকজ্জল অশ্রুসজল নয়ন দুইটিতে যে ব্যাকুলতা দেখিয়াছি, অন্তরে তাহারা হয়ত একই জাতীয় স্পন্দন দিয়াছে। প্রতিটি অনুভূতি রাখিয়া গিয়াছে মনের বিগলিত লাক্ষাধাতুতে স্পন্দনের অঙ্কন সংস্কারের রূপে; বহুদিনের সেই সংস্কার-রাশি একত্রিত হইয়া গড়িয়া তোলে আমাদের বাসনা। সেই রাজ্যে একই অনুভূতির সূত্রে গাঁথা রহিয়াছে সমজাতীয় বহির্বস্তু বা ঘটনাগুলি,—একের সহিত অপরে রহিয়াছে যেন অবিচ্ছিন্ন ভাবে মিলিয়া মিশিয়া; একে তাই জাগাইয়া তোলে অপরের স্মৃতি। বাহিরে আজ আবার যখন নূতন করিয়া আসে নূতন দৃশ্য, গন্ধ, স্পর্শ, সঙ্গীত,—মনের

ভিতরে অবিচ্ছিন্ন ভাবে ভিড় করিয়া ওঠে যেন বাসনার মধ্যে নিহিত সেই লক্ষ অনুভূতির স্মৃতিকণা তাহাদের বাহিরের কারণের একটা অতি অস্পষ্ট আভাস-ইঙ্গিত লইয়া। আজ তাহাদের স্পষ্ট কোন রূপ নাই, —তাহারা সকলে যেন মিলিয়া মিশিয়া যায় অন্তরের একটা গভীর অনুভূতিতে। কালিদাস নিজেই এসম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতো ঽপিজন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তর-সৌহৃদানি ॥

অর্থাৎ,—'রম্য দৃশ্য দেখিয়া অথবা মধুর শব্দ শুনিয়া যে সুখী প্রাণীর চিত্তও ব্যাকুল হইয়া ওঠে, তাহার কারণ এই, জীবগণ হয়ত তখন জন্মান্তরের বাসনায় স্থিরবদ্ধ কোন সৌহার্দ্যকেই আপনার অজ্ঞাতে স্মরণ করে।' কালিদাসও বলিতেছেন,—'স্মরতি নূনমবোধপূর্বম্'— নিজের অজ্ঞাতেই অবচেতন-লোকে এই স্মরণ হইয়াছে। এই অবোধপূর্ব স্মরণই বাসনার স্পন্দন। বাহিরের তন্ত্রীতে আঘাত পড়িলেই বায়ুমণ্ডলের স্পন্দন গিয়া আবার স্পন্দন তোলে হৃদয়ের বাসনা-তন্ত্রীতে। মনে তখন ইন্দ্রধনুর সূক্ষ্ম বর্ণ-বৈচিত্র্যের আভাস লইয়া জাগিয়া ওঠে যেন জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি,—তাহাতেই হয় গভীর রস-সঞ্চার।

আমাদের শিল্পরসের আস্বাদনের ভিতরে সর্বত্রই থাকে একটা প্রচ্ছন্ন স্মৃতি। এই বিশ্বসৃষ্টিকে যেন কতবার কত রকম করিয়া দেখিয়াছি। সেই সকল দেখা, সকল অনুভূতি যেন মিশিয়া আছে আমাদের দেহ-মনের অণুতে পরমাণুতে। বাহিরে আজ যাহাকে দেখিতেছি অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ, অন্তরে সে যে কত স্মৃতি অঙ্গে মাখিয়া

কতখানি বৃহৎ হইয়া হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছে তাহার খোঁজ আমরা নিজেরাই জানি না। কালিদাস যাহাকে অবোধপূর্ব স্মরণ বলিয়াছেন তাহা এই বাসনার স্মৃতি। কবি যে বিশ্ব-সৃষ্টিকে সাধারণ লোক অপেক্ষা অনেক গভীর অনেক সুন্দর করিয়া দেখেন, তাহার মুখ্য কারণ এই বাসনার তারতম্য। জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে কবি যে বাসনা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন সে বাসনা সাধারণ লোকের বাসনা হইতে অনেক গভীর, তাই তাঁহার অনুভূতিও অনেক গভীর। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'কড়ি ও কোমল' কাব্য-গ্রন্থে 'স্মৃতি' কবিতাটিতে বলিয়াছেন,—

ওই দেহপানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্ব জনমের স্মৃতি।
সহস্র হারাণ সুখ আছে ও নয়নে,
জন্ম-জন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।
যেন গো আমারি তুমি আত্ম-বিস্মরণ,
অনন্তকালের মোর সুখ দুঃখ শোক,
কত নব জনমের কুসুম কানন,
কত নব আকাশের চাঁদের আলোক।
কত দিবসের তুমি বিরহের ব্যথা,
কত রজনীর তুমি প্রণয়ের লাজ,
সেই হাসি সেই অশ্রু সেই সব কথা
মধুর মূরতি ধরি' দেখা দিল আজ।
তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশিদিন
জীবন সুদূরে যেন হ'তেছে বিলীন॥

এতখানি পূর্বস্মৃতি, এতখানি বাসনা অঙ্গে মাখিয়াই বাস্তব প্রিয়া কবির নিকট এতখানি সুন্দর এবং মধুর হইয়া ওঠে। 'চৈতালী'র 'মানসী'

কবিতাটিতেও রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—নারীর রূপ এবং মহিমা শুধু তাহার বাস্তব সত্তার মধ্যে নাই,—নারী পুরুষের 'মানসী'।

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী।
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি'
আপন অন্তর হ'তে। বসি কবিগণ
সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার পরে নূতন মহিমা
অমর করেছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।
... ...
পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা,
অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা॥

নারীর এই যে মানসী মূর্তি তাহাই তাহার বাসনাময়ী মূর্তি। কবি তাহার সম্বন্ধে যত উপমার পর উপমা দিতেছেন সে সকল উপমাই গৃহীত তাঁহার বাসনা হইতে। বাসনার ভিতরেই :সকল উপমার উৎপত্তি। কাব্যের নারী অনেকখানিই বাসনাময়ী নারী। রবীন্দ্রনাথ কাব্যের নারী সম্বন্ধে এই যে কথা বলিয়াছেন, শুধু কাব্যের নারী সম্বন্ধে নহে, কাব্যের সমগ্র জগৎ সম্বন্ধেই এই একই কথা প্রযোজ্য। কাব্যের জগৎটা বাস্তব জগৎ নহে,—উহা মানুষের মানসী সৃষ্টি,—বাসনাময়ী মূর্তি,—মানুষের স্মৃতির জগৎ।

এই স্মৃতির ভিতরে প্রকারভেদ রহিয়াছে। মানুষের অন্তরের যে গভীরতম স্মৃতি তাহাকে বলা যায় মানুষের বাসনা, সে স্মৃতি 'অবোধ-পূর্বম্'। এই বাসনার এক পরদা উপরে যে স্মৃতি তাহাকে আমরা নাম দিতে পারি সংস্কার ; তাহাও বাসনার ন্যায় গভীর এবং অবোধপূর্ব না হইলেও সে আমাদের মনের উপরে ভাসিয়া ওঠে না। মনের

উপরে ভাসিয়া ওঠে অথচ দেশকালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে, এমন অস্পষ্ট স্মৃতির নাম দেওয়া যাইতে পারে 'প্রমুষ্টতত্তাক-স্মৃতি'। "প্রমুষ্ট শব্দের অর্থ অপহৃত বা লুপ্ত। তত্তা শব্দের অর্থ সেই সেই বস্তু। প্রমুষ্টতত্তাক-স্মৃতি বলিতে সেই স্মৃতিকে বুঝায় যেখানে স্মরণ আছে, অথচ কি স্মরণ হইল তাহার বোধ নাই। কবি যখন তাহার বাতায়ন-পথে উদার বিরাট মাঠের দিকে তাকাইয়া থাকেন, তখন যদি আরও যে মাঠ তিনি পূর্বে দেখিয়াছেন তাহা তাঁহার মনে পড়ে তখন তাহাকে স্মরণ বলা যায়; কিন্তু যখন কোন পরিচিত মাঠের কথা স্মরণ পড়ে না, অথচ পূর্ব্বানুভূত একটি প্রশস্ততা মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠে, তখন তাহাকে বলা যায় প্রমুষ্টতত্তাক-স্মৃতি। এই প্রমুষ্ট-তত্তাক-স্মৃতির পিছনে থাকে সংস্কার। সংস্কার চিত্তের উপরে ভাসিয়া উঠে না, সে থাকে এক পরদা নীচে। এই সংস্কারের মধ্যে ওই রকম মাঠ দেখিয়া নানা বিচিত্র অবস্থায় নানা বিচিত্র ব্যবস্থায় সুহৃৎ-সঙ্গে জ্যোৎস্নালোকে নদীতীরে পূর্বে যা কিছু আনন্দ অনুভূত হইয়াছিল তাহা সঞ্চিত হইয়া একত্র পিণ্ডীভূত হইয়া স্মৃতির ভূমিকে অব্যক্তভাবে রসপূরিত করিয়া তুলে। এই প্রমুষ্টতত্তাকস্মৃতি ও সংস্কারের যৌথ নাম বাসনা।" *

তাহা হইলে দেখিতেছি, আমাদের স্মৃতির ভিতরে গভীরতার তারতম্যে আমরা এই কয়টি ভাগ করিতে পারি; প্রথমতঃ সাধারণ স্মরণ। মানুষের মানসিক বৃত্তিগুলির ভিতরে এমন কতগুলি ধর্ম আছে যাহা দ্বারা মন সদৃশ বস্তুর অনুভূতিকে বা কোনওরূপে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বস্তুর অনুভূতিকে একত্রে ধরিয়া রাখিতে পারে। মনের ভিতরে এইরূপে নানাভাবে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া থাকে বলিয়া একটি

* সাহিত্য-পরিচয়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, পৃঃ ১৪-১৫।

বস্তু বা ঘটনার অনুভূতি সমজাতীয় অনুভূতিদায়ক বস্তু বা ঘটনার প্রতিচ্ছবিকে মনের ভিতরে জাগাইয়া তুলিতে পারে। ইহাই সাধারণ স্মরণ। এই সাধারণ স্মরণের পর প্রমুষ্টতত্তাক-স্মৃতি,—দেশকাল পাত্রের স্পষ্টগুণবর্জিত একটি অস্পষ্ট স্মরণ। তাহার পরে সংস্কার,—গভীরতম স্মৃতি আমাদের বাসনা।

উপমা প্রভৃতি অর্থালঙ্কারের পশ্চাতেও রহিয়াছে কোন না কোন রকমের স্মৃতি। স্মৃতি-বৈচিত্র্যে আসে অলঙ্কারের বৈচিত্র্য। সুতরাং দেখিতে পাইতেছি,—এই স্মৃতির ভিতর দিয়া উপমা প্রভৃতি অর্থালঙ্কার কাব্যের মূলধর্মের সহিতই গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে।

আমরা দেখিয়াছি, ভাষার সাহায্যে আমরা যাহাকে কাব্যে রূপ দিতে চাই, তাহা একান্ত কোন বাহ্যবস্তু বা বাহ্য ঘটনা নহে,—তাহা কোন বিশেষ বহির্বস্তু বা ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া আমাদের চিত্তের যে বাসনার উদ্রেক তাহাই। এই বাসনার কোন স্পষ্ট মূর্তি নাই,—তাই তাহাকে স্পষ্ট করিয়া কোন ভাষার সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না। তাই যখন কোন বাসনার উদ্রেক হয় তখন আমরা যে-জাতীয় বস্তুসমূহের ভিতর দিয়া এই জাতীয় বাসনা লাভ করিয়াছি সেই জাতীয় সকল বস্তুর চিত্র আঁকিয়াই আবার তাহাকে বাহিরে প্রকাশ করিতে চাই। তখনই আসে উপমার পর উপমা,—উৎপ্রেক্ষার পর উৎপ্রেক্ষা,—যেন এই রকম,—কিন্তু ঠিক যে কোন্ রকম, বাসনার সে মূর্তিকে কবি নিজেই যেন প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না। 'কাদম্বরী'র কবি শুধু 'ইব'র পর 'ইব' বসাইয়া যাইতেছেন,—কিন্তু তবু যেন বাসনার রঙকে কিছুতেই আর বাহিরে আঁকিয়া তোলা যাইতেছে না,—কোনো রঙই যেন সেই বাসনার রঙের সমান হইতেছে না। বহির্বস্তু বা ঘটনার অবলম্বনে কবির মনে যে বাসনা জাগিয়া ওঠে, সেই বাসনাই আবার

সহৃদয় পাঠকের মনে উদ্রিক্ত হইয়া ওঠে ভাষার ভিতর দিয়া। কবি তাই সব-জাতীয় চিত্রের পর চিত্র পাঠকের সম্মুখে ধরিয়া সঙ্গীতে এবং চিত্রে সেই বাসনাকে জাগাইয়া তোলেন। তখন বক্তব্য বস্তুকে অনেক বড় করিয়া বলিতে হয়,—অনেকখানি বেশী করিয়া বলিতে হয়,—অনেক বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া তাহার আভাস দিতে হয়। পূর্বেই দেখিয়াছি, এই চিত্রের পর চিত্র আঁকিতে কবির নূতন করিয়া সৃষ্টিকে পর্যবেক্ষণ করিতে হয় না,—সাধর্ম্যের যোগসূত্রেই তাহারা একের সহিত অপরে আসিয়া যুক্ত হয়। কবির কল্পনা তাই অনেকখানি নির্ভর করে কবির পূর্বানুভূতির উপরে। এই পূর্বানুভূতিকে বাদ দিয়া মন নূতন করিয়া কিছুই গড়িয়া পিটিয়া তৈয়ার করিয়া লইতে পারে না। এই ভাবেই সৃষ্টি সমস্ত অর্থালঙ্কারের, এই ভাবেই তাহারা ভাষার দৈন্যকে অনেক পরিমাণে ঘুচাইয়া দিয়া অন্তরের বাসনার উদ্রেক-জনিত ভাবসম্বেগকে বাহিরে প্রকাশ করিতে সাহায্য করে।

আমরা প্রথমেই দেখিয়া আসিয়াছি, সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থে আমরা যত প্রকার অর্থালঙ্কারের সন্ধান পাই, সকলের পশ্চাতে রহিয়াছে একটি মূল সত্য,—বস্তুর সহিত বস্তুর কোন না কোন সাধর্ম্য বা সামান্যগুণ। বস্তুর প্রকৃতিগত এই সাধর্ম্যই মনের ভিতরে সৃষ্টি করে সমজাতীয় অনুভূতি,—সেই অনুভূতিগুলির সংস্কার এবং প্রমুষ্টতত্তাক-স্মৃতি একত্রিত হইয়া যে বাসনার সৃষ্টি করে সেই বাসনার ভিতরে সমধর্মী সকল বস্তুই সূক্ষ্ম বীজাকারে বিধৃত হইয়া থাকে,—এইখানেই মনোরাজ্যের ভিতরে এই সকল সমধর্মী বস্তুগুলির ভিতরে নিহিত থাকে একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্র। এই সূক্ষ্ম যোগসূত্রটি রহিয়াছে সকল অর্থালঙ্কারের মূলীভূত কারণস্বরূপ; ইহারই নানারূপ বৈচিত্র্যে জাগিয়াছে অর্থালঙ্কারের প্রকারভেদ।

আমরা বলিয়াছি যে কবি যেখানে নারীসৌন্দর্য বর্ণনা করিতে বসেন, সে নারী কোনো বাস্তব নারী নহে,—কোনো বাস্তব নারী অবলম্বনে অন্তরে জাগিয়া ওঠে যে বাসনাময়ী নারীমূর্তি সুরের পর সুর, রেখার পর রেখা, রঙের পর রঙ লাগাইয়া কবি তখন সেই বাসনাময়ী নারীমূর্তিকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। বিশ্বসৃষ্টির যেখানে যাহা কিছু আছে কমনীয় ও মধুর তাহাদ্বারাই চলে প্রিয়তমার রূপ-বর্ণনা। 'মেঘদূত' কাব্যের উত্তরমেঘে যক্ষ মেঘদূতকে তাহার বিরহিণী প্রিয়ার নিকট এই কথাটি বলিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়া দিতেছে,—

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণী-প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি॥ (৪৩)

অর্থাৎ,—'হে প্রিয়ে, শ্যামালতায় তোমার অঙ্গ, চকিত হরিণীর দৃষ্টিতে তোমার দৃষ্টিপাত, চন্দ্রে তোমার আনন-সৌন্দর্য, ময়ূরের পুচ্ছে তোমার কেশভার, নদীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্মিমালায় তোমার ভ্রূ-বিলাস দেখিতে চাহিয়াছি; কিন্তু হায়,—কোন এক বস্তুতে তোমার সাদৃশ্য পাইলাম না।' * যক্ষ মেঘদূতকে বলিতেছে,—এই যে আমি শ্যামালতায় আমার প্রিয়তমার অঙ্গলাবণ্যের সন্ধান করিয়াছি,—চকিত হরিণীর

* তুলনীয়—ইন্দুমতীর জন্য অজের বিলাপ—

কলমন্যভৃতাসু ভাষিতং
কলহংসীষু মদালসং গতম।
পৃষতীষু বিলোলমীক্ষিতং
পবনাধূতলতাসু বিভ্রমাঃ॥

দৃষ্টিপাতে তাহার চঞ্চল দৃষ্টি খুঁজিয়াছি, চন্দ্রে তাহার মুখের ঔজ্জ্বল্য, ময়ূরপুচ্ছে তাহার কেশভার এবং ছোট নদীর ঢেউয়ে যে তাহার ভ্রূবিলাসের সন্ধান করিয়াছি, তাহাতেই হয়ত আমার প্রিয়তমা আমার ধৃষ্টতা দেখিয়া প্রচণ্ড রোষাবিষ্টা হইয়াছে,—কারণ ইহার কাহারও সহিত তাহার কোন অঙ্গলাবণ্যের তুলনা হয় না; কিন্তু মেঘ তুমি তাহাকে অনুনয় করিয়া কহিও,—আমি নিজেই আমার এই এত বড় ভুলের জন্য দুঃখিত,—"হন্ত"। আমি সত্যই ইহার কোথাও তাহার অঙ্গলাবণ্যের এতটুকু খুঁজিয়া পাই নাই। এই যে বিরহী যক্ষের অলকাপুরীস্থিত বিরহী প্রিয়তমা সে অনেকখানিই যক্ষের বাসনার প্রিয়তমা। বাহিরে কোথাও যেন তাই আজ আর তাহার কোন সাদৃশ্য মেলে না,—'কাঙ্গাল নয়ন' যেন শুধু 'দ্বার হইতে দ্বারে' ঘুরিয়া মরে। 'কুমারসম্ভবে' উমার রূপ বর্ণনায় কালিদাসকে কত রঙের উপর রঙ চড়াইয়া চিত্রের পর চিত্র আঁকিতে হইয়াছে।

উন্মীলিতং তূলিকয়েব চিত্রং
সূর্যাংশুভির্ভিন্নমিবারবিন্দম্।
বভূব তস্যাশ্চতুরস্রশোভি
বপুর্বিভক্তং নবযৌবনেন॥ (১।৩২)

নবযৌবন উদ্‌গমে উমার যে রূপ অভিব্যঞ্জিত হইয়া উঠিল,—তাহা যেন তূলিকায় অঙ্কিত একখানি চিত্র,—নবযৌবনের স্পর্শে তাহার অঙ্গের লাবণ্য যেন সূর্যের কিরণস্পর্শে উদ্‌ভিন্ন অরবিন্দের শোভা। 'তূলিকয়েব

ত্রিদিবোৎসুকয়াপ্যবেক্ষ্য মাং
নিহিতাঃ সত্যমমী গুণাস্ত্বয়া।
বিরহে তব মে গুরুব্যথং
হৃদয়ং ন ত্ববলম্বিতুং ক্ষমাঃ॥ রঘুবংশ, ৮।৫৯-৬০

চিত্রম্' বলিবার তাৎপর্য এই, চিত্রশিল্পী যেমন নিজের ইচ্ছামত রেখা-দ্বারা বর্ণ-বৈচিত্র্যের দ্বারা নিজের মানস-সুন্দরীর রূপ দিতে পারেন, বিশ্বশিল্পী বিধাতাও যেন সেইরূপ শিল্পীর ন্যায় ধ্যান-সমাহিত হইয়া নিজের মানসী নারীকেই রেখার সূক্ষ্মতায় বর্ণের মাধুর্যে রূপ দিয়াছেন উমার ভিতরে। শকুন্তলার রূপ বর্ণনার ভিতরেও রাজা দুষ্যন্ত বলিতেছেন,—

চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিত-সত্ত্বযোগা
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ ॥

মনে হয় বিধাতা প্রথমে ইহাকে চিত্রে আঁকিয়াছেন,—যেখানে যে রেখা, যেখানে যে বর্ণ, যেখানে যে ভঙ্গির প্রয়োজন প্রথমে সমস্তই ইচ্ছামত চিত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়া পরে যেন সেই চিত্রকেই প্রাণদান করিয়াছেন। অথবা মনে হয়, এ দেহ যেন বাস্তব কোন উপাদানেই গঠিত নয়, বিধাতা যেন প্রথমে তাঁহার শিল্পধ্যানে এই দেহটি দর্শন করিয়াছেন, তারপরে মানস রূপোচ্চয়ের দ্বারা মনে মনেই যেন এই অপরা স্ত্রীরত্ন সৃষ্টি করিয়াছেন। শকুন্তলা এখানে শুধু দুষ্যন্তেরই বাসনার প্রতিমূর্তি নয়,—সে যেন বিধাতা-পুরুষেরই বাসনার প্রতিমূর্তি।

'কুমারসম্ভবে' উমার রূপ বর্ণনা করিতে কবি বলিতেছেন,—উমার চরণযুগল পৃথিবীতলে বিন্যস্ত হইলে তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলি দুইটির নখকান্তির ভিতর দিয়া যেন একটা আরক্তিম প্রভা বিচ্ছুরিত হইত,—মনে হইত যেন পৃথিবীতলে সঞ্চারমান দুইটি স্থলপদ্ম।—

অভ্যুন্নতাঙ্গুষ্ঠনখ-প্রভাভি-
র্নিক্ষেপণাদ্রাগমিবোদ্গিরন্তৌ।

আজহ্রতুস্তচ্চরণৌ পৃথিব্যাং
স্থলারবিন্দশ্রিয়মব্যবস্থাম্ ॥ (১।৩৩)

উমা যখন চলিত তখন, 'সা রাজহংসৈরিব সন্নতাঙ্গী'। উদ্ভিন্ন-যৌবনা কিশোরী ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গিতে যেন 'রাজহংসৈরিব সন্নতাঙ্গী'। তারপরে উমা যেদিন মহাদেবের তপোভঙ্গ করিতে চলিল, সেদিন তাহার অঙ্গে অশোককুসুম পদ্মরাগমণিকে ভৎ´সনা করিয়াছিল, কর্ণিকার পুষ্প স্বর্ণের দ্যুতি কাড়িয়া লইয়াছিল,—সিন্ধুবার পুষ্পের দ্বারা তাহার মুক্তার মালা গাঁথা হইয়াছিল,—এইরূপে বসন্তের পুষ্পসম্ভার অঙ্গে বহন করিয়া উমা পথ চলিতেছিল।

অশোকনির্ভৎ´সিতপদ্মরাগ-
মাকৃষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারম্।
মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারং
বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী ॥ (৩।৫৩)

এই 'বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী' কথাটার ভিতরে যেন একটা বাচ্যার্থের সহিত সুকুমার ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে। অশোক, কর্ণিকার এবং সিন্ধুবারে সজ্জিত উমা ত 'বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী' বটেই;—কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ধ্বনিত হইয়া ওঠে অঙ্গে অঙ্গে নব যৌবনের বসন্তের ফুল। শকুন্তলার বর্ণনায়ও কবি বলিয়াছেন,—কুসুমের ন্যায় যৌবন যেন শকুন্তলার প্রতি অঙ্গে অঙ্গে।—

অধরঃ কিশলয়রাগঃ
কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং
যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্ ॥

অধর যেন নবোদ্‌গত পল্লবের তরুণিমা,—বাহুযুগল যেন কোমল

বিটপ,—আর কুসুমের ন্যায় প্রস্ফুট যৌবন যেন সমস্ত অঙ্গে বাঁধা পড়িয়া রহিয়াছে।

উমা যখন বসন্তপুষ্পাভরণে ভূষিতা হইয়া সঞ্চরণ করিতেছিল তখন মনে হইতেছিল,—

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব॥ (৩।৫৪)

স্তনদ্বয়ের ভারে ঈষৎ অবনমিতা তরুণ অরুণবৎ রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিহিতা পার্বতী যেন প্রচুর পুষ্পস্তবকে অবনম্র একটি সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা। উৎপ্রেক্ষাটির সমগ্র ধ্বনিটিই যে অতি মনোহর শুধু তাহা নহে,—ইহার প্রত্যেকটি শব্দও সার্থক। একদিকে নব যৌবনে স্তনভারো একটুখানি নুইয়া-পড়া উমা, অন্য দিকে পর্যাপ্তপুষ্পের স্তবকভারে আনম্রা লতা; একদিকে উমার বসনের তরুণার্করাগ,—অন্যদিকে 'পল্লবিনী'র নবকিশলয়ের আরক্তিম বর্ণচ্ছটা; আর গতিশীলা উমার তন্বী অঙ্গের ভঙ্গিমা, যেন সঞ্চারিণী পল্লবিনীর লাস্য-ভঙ্গি।*

মহেশ্বর কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া উমা তাহার নবযৌবনের রূপ-সম্ভারকে নিজেই নিজের অন্তরে নিন্দা করিয়াছিল। নিজের 'অবন্ধ্যরূপতা'র জন্য পার্বতী কঠোর তপস্বিনী মূর্তি ধারণ করিলেন। তখন পুনরায় গ্রহণের ইচ্ছায় যেন উমা তাহার

---

* তুঃ—ইমাং তটাশোকলতাঞ্চ তন্বীং
স্তনাভিরামস্তবকাভিনম্রাম্। রঘুবংশ, ১৩।৩২

দেহের সকল রূপ-মাধুর্য এক একটি বস্তু বা প্রাণীর কাছে রাখিয়া গেল।

পুনর্গ্রহীতুং নিয়মস্থয়া তয়া
দ্বয়েঽপি নিক্ষেপ ইবার্পিতং দ্বয়ম্।
লতাসু তন্বীষু বিলাসচেষ্টিতং
বিলোলদৃষ্টং হরিণাঙ্গনাসু চ ॥ (৫।১৩)

তন্বী লতিকার নিকট উমা গচ্ছিত রাখিল তাহার বিলাস বিভ্রম,—চঞ্চলা হরিণীর নিকট রাখিয়া গেল চোখের দুইটি চঞ্চল চাহনি।

অবশ্য ইহা অপেক্ষা আরও একটু সৌকুমার্য প্রকাশ পাইয়াছে উমার প্রথম যৌবন বর্ণনার সময়। সেখানে বলা হইয়াছে,—

প্রবাতনীলোৎপলনির্বিশেষ-
মধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যা।
তয়া গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভ্য-
স্ততো গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভিঃ ॥ ১।৪৬

আয়তাক্ষী উমার বায়ুবিকম্পিত নীলোৎপলের ন্যায় যে চকিত বিলোকিত—তাহা সে মৃগাঙ্গনাগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিল, অথবা মৃগাঙ্গনাগণ তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিল? এখানে উপমা দ্বারা ব্যঞ্জিত যে সাধর্ম্য তাহা সন্দেহের দ্বারা সমধিক চমৎকারিত্ব লাভ করিয়াছে।

বিবাহের পূর্বে মঙ্গলস্নাতা স্বামিমিলনযোগ্যা ধৌতবসনা পার্বতী শোভা পাইতেছিল মেঘবারিবর্ষণে অভিষিক্তা বিকশিতশুভ্রকাশ-শোভিতা বসুধারই মতন।

সা মঙ্গলস্নানবিশুদ্ধগাত্রী
গৃহীতপত্যুদ্গমনীয়বস্ত্রা।

নির্বৃত্তপর্জন্যজলাভিষেকা
প্রফুল্লকাশা বসুধেব রেজে ॥ (৭।১১)

সাদৃশ্য অপেক্ষাও এখানে ব্যঞ্জনার চমৎকারিত্ব লক্ষণীয়। মহাদেবের সহিত উমার মিলন কুমার-সম্ভবের জন্য। মাতা ধরিত্রী বর্ষায় স্নাতা হন, বর্ষাগমে শরতে কাশকুসুমে ধৌতবস্ত্রপরিহিতা হন এবং হেমন্তে শস্যশালিনী মাতৃমূর্তি পরিগ্রহ করেন। উমার শিব-মিলন এবং কুমার-সম্ভাবনার অতি চমৎকার একটা ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিয়াছে ধরিত্রীর সহিত উমার এই উপমার মধ্যে। তারপরে দেখি, বিবাহের পূর্বে সখীগণ কর্তৃক সজ্জিতা পার্বতী—

সা সম্ভবদ্ভিঃ কুসুমৈর্লতেব
জ্যোতির্ভিরুদ্যদ্ভিরিব ত্রিযামা।
সরিদ্বিহঙ্গৈরিব লীয়মানৈ-
রামুচ্যমানাভরণা চকাশে ॥ (৭।২১)

নানা আভরণে ভূষিতা উমা যেন একটি কুসুমিতা লতা,—যেন নক্ষত্রোদ্ভাসিতা রজনী, যেন বিহঙ্গ-শোভিতা একটি তটিনী।

তাহার পরে দেখি,—

ক্ষীরোদবেলেব সফেনপুঞ্জা
পর্যাপ্তচন্দ্রেব শরৎত্রিযামা।
নবং নবক্ষৌমনিবাসিনী সা
ভূয়ো বভৌ দর্পণমাদধানা ॥ (৭।২৬)

নব-দুকূলনিবাসিনী ও দর্পণহস্তা পার্বতী যেন সফেনপুঞ্জ সমুদ্রবেলা—যেন পরিপূর্ণচন্দ্রশোভিতা একটি শরৎ-রজনী। বেশ বোঝা যায়,

কবিচিত্তের একটি বিরাট অনুভূতির ভিতরে নারীসৌন্দর্য এবং বিশ্বসৌন্দর্য যেন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া রহিয়াছে।

বিবাহের পরে পুরোহিত ব্রাহ্মণ বর-বধূ হর-পার্বতীর যজ্ঞ সম্পন্ন করাইলেন। এই যজ্ঞকার্যে আচার-অনুরোধে লাজধূম গ্রহণ করাতে বধূ পার্বতীর গণ্ডস্থল ঈষৎ ঘর্মাক্ত ও অরুণবর্ণ হইয়া উঠিল, নয়নের কৃষ্ণাঞ্জনরাগ স্ফীত হইল এবং যবাঙ্কুরবিরচিত কর্ণাভরণ ম্লান হইয়া গেল। যজ্ঞ-প্রতপ্তা পার্বতীকে পুরোহিত ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'বৎসে, এই বহ্নি তোমার বিবাহকর্মের সাক্ষী ; ইহার পর তুমি অবিচারিত-চিত্তে পতি মহাদেবের সহিত ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান করিবে।' যজ্ঞান্তে পুরোহিতের এই বাণী পার্বতীর কাছে কিরূপ প্রতীয়মান হইয়াছিল ?

আলোচনান্তং শ্রবণে বিতত্য
পীতং গুরোস্তদ্বচনং ভবান্যা।
নিদাঘকালোল্বণতাপয়েব
মাহেন্দ্রমম্ভঃ প্রথমং পৃথিব্যা ॥ (৭।৮৪)

নয়নের প্রান্তভাগ পর্যন্ত কর্ণযুগল বিস্তৃত করিয়া পার্বতী সাগ্রহে সেই কথাগুলি যেন পান করিতে লাগিলেন—যেমন পান করে নিদাঘসন্তপ্ত পৃথিবী প্রথম পতিত বৃষ্টিজল।

উমার অঙ্গে যে ভাবভঙ্গরূপ পুলক তাহাকেও কালিদাস অপরূপ রূপ দান করিয়াছেন একটি উপমায়—

বিবৃণ্বতী শৈলসুতাপি ভাব-
মঙ্গৈঃ স্ফুরদ্‌বালকদম্বকল্পৈঃ। (৩।৬৮)

উমার অঙ্গের যে ভাবভঙ্গ উহা যেন বিকসিত বালকদম্ব। এই উপমাটি ভবভূতিও গ্রহণ করিয়াছেন সীতার বর্ণনায়। সেখানে

প্রিয়স্পর্শসুখে সীতার স্বেদযুক্ত, রোমাঞ্চিত এবং কম্পিত দেহকেও মরুৎ-আন্দোলিত নববর্ষায় সিক্ত স্ফুটকোরক কদম্বশাখার সহিত তুলনা করা হইয়াছে।—

সস্বেদরোমাঞ্চিতকম্পিতাঙ্গী
জাতা প্রিয়স্পর্শসুখেন বৎসা।
মরুন্নবাম্ভঃপ্রবিধূতসিক্তা
কদম্বযষ্টিঃ স্ফুটকোরকেব॥

পরবর্তী কালে বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাস মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ভাবপুলক বর্ণনা করিতেও এই উপমাটির চমৎকার ব্যবহার করিয়াছেন।*

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' দেখিতে পাই,—আলবালে জলসেচন নিরতা শকুন্তলাকে অনসূয়া বলিতেছে—'হলা সউন্দলে তুবত্তো বি তাদকস্সবস্স ইমে অস্সমরুক্খা পিঅদরে ত্তি তক্কেমি, জেণ ণোমালিআ-কুসুম-পেলবা বি তুমং এদানং আলবালপূরণে ণিউত্তা।'—অর্থাৎ, শকুন্তলা, আমার মনে হয়, এই আশ্রম বৃক্ষগুলি তোমা অপেক্ষাও তাত কাশ্যপের প্রিয়তর; 'যেহেতু, নবমালিকা-কুসুম-পেলবা তুমিও ইহাদের আলবালপূরণে নিযুক্ত হইয়াছ। অনসূয়ার এই একটি মাত্র পরিহাসবচনের ভিতর দিয়া যেন নবযৌবনা শকুন্তলার 'ণোমালিআকুসুমপেলবা' রূপটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পরক্ষণেই দেখিতে পাই, শকুন্তলা বলিতেছে,

* নীরদ নয়ানে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত 
বিকসিত ভাবকদম্ব॥

—সখি অনসূয়ে,—প্রিয়ংবদা অতি শক্ত করিয়া বল্কল বাঁধিয়া দিয়াছে, একটু শিথিল করিয়া দাও। প্রিয়ংবদা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিয়াছিল, আপন উদ্ভিন্ন-যৌবনকে তিরস্কার কর! এই শকুন্তলাইত 'সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যম্'। বল্কল-পরিহিতা শকুন্তলা সম্বন্ধে রাজা দুষ্মন্ত বলিয়াছেন,—

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥

শৈবলের দ্বারা আবৃত হইলেও কমল রম্য; পূর্ণিমাচন্দ্রের শোভা কলঙ্কচিহ্ন-স্পর্শেও বিকাশ লাভ করে; কিন্তু 'ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী',—শকুন্তলার তন্বী দেহখানি যেন বল্কলে আবৃত হইয়া অধিক মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে! স্বভাবসুন্দর বস্তু যে নিরাভরণ হইয়া অসজ্জিত স্থানে থাকিয়াও শুধু আপন সৌন্দর্য রক্ষা করে তাহা নহে, অযত্ন রক্ষিতভাবে বিজাতীয় বস্তুর সংস্পর্শে তাহার স্বভাব-সৌন্দর্য যেন একটা অপূর্ব চারুতাই লাভ করে। মনের পটভূমিতে সেখানে থাকে যেন একটা পরস্পর তুলনাজনিত তারতম্যের বোধ,—সেই তারতম্যেই যেন সে অধিক মনোজ্ঞ হইয়া ওঠে। কোথায় কুসুমপেলব শকুন্তলার নবযৌবনের দুর্লভ তনু,—আর কোথায় তরুলতাবৃত মুনির আশ্রম—কোথায় বল্কল পরিধান, —জলপূর্ণ কলসীভারে পীড়িত হইয়া আলবালে জল-সেচন! কিন্তু তবু মনে হয়, নগরের উদ্যান-লতা হইতে 'ইয়মধিক মনোজ্ঞা!' এই জন্যই সখীগণসহ আলবালে জল-সেচনরতা শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজা দুষ্মন্ত যে বলিয়াছিলেন,—'দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ'

—অর্থাৎ এই সব বনলতাগণ কর্তৃক নাগরিক যত উদ্যানলতা সবই দূরীকৃতা হইয়াছে—ইহা অতিশয় সত্য ভাষণই হইয়াছে।

'কুমার-সম্ভবে' জটাবল্কলধারিণী উমা সম্বন্ধেও কবি বলিয়াছেন,—

যথা প্রসিদ্ধৈর্মধুরং শিরোরুহৈ-
র্জটাভিরপ্যেবমভূত্তদাননম্।
ন ষট্‌পদশ্রেণিভিরেব পঙ্কজং
সশৈবলাসঙ্গমপি প্রকাশতে ॥ (৫।৯)

উমার আনন প্রসিদ্ধ কেশগুচ্ছে যেমন মধুর শোভা পাইত,—জটাতেও তেমনই শোভা পাইতেছিল; পদ্ম যে শুধু ভ্রমর সঙ্গেই শোভা পায় তাহা নহে,—শৈবল সহযোগেও তাহার শোভা প্রকাশ পায়।

দুষ্যন্তের স্মরণে জাগ্রতা মনোময়ী শকুন্তলা যেন একটি অনাঘ্রাত পুষ্প, যেন নখ দ্বারা অচ্ছিন্ন কিশলয়,—যেন অনাবিদ্ধ রত্ন, যেন অনাস্বাদিতরস মধু,—যেন পুণ্যরাশির মূর্তিমান্ অখণ্ড ফল!

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলূনং কররুহৈ-
রনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ ॥

ইহা শুধু ফুলের সহিত, কিশলয়ের সহিত, রত্ন বা মধুর সহিত শকুন্তলার তুলনা মাত্র নহে,—প্রত্যেকটি উপমার পশ্চাতে রহিয়াছে রাজার উন্মথিত বাসনার স্পন্দন। শকুন্তলার রূপ দুষ্যন্তের চক্ষে যেন বিশ্বের কামনার প্রতিমূর্তি,—সে পরম লোভনীয়া। শকুন্তলার সৌন্দর্যের সমগ্র লোভনীয়তা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে এই উপমানগুলির

বিশেষণ কয়টির ভিতর দিয়া, যেন অনাঘ্রাত পুষ্প,—অচ্ছিন্ন কিশলয়,—অনাবিদ্ধ রত্ন,—অনাস্বাদিতরস মধু।

'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে মালবিকার রূপ সম্বন্ধে রাজা অগ্নিমিত্র বলিতেছেন,—পাণ্ডুগণ্ডস্থল এবং পরিমিত আভরণ সহ মালবিকা যেন—

মাধব-পরিণত-পত্রা কতিপয়কুসুমেব কুন্দলতা।

যেন বসন্তের পাণ্ডুর পরিণতপত্র এবং কয়েকটি ফুল লইয়া একটি কুন্দলতা। অন্যত্রও অগ্নিমিত্র মালবিকা সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

অনতিলম্বিদুকূলনিবাসিনী
লঘুভিরাভরণৈঃ প্রতিভাতি মে।
উড়ুগণৈরুদয়োন্মুখচন্দ্রিকা
হতহিমৈরিব চৈত্র-বিভাবরী॥ (৫।৩৫)

মালবিকা অনতিলম্বী দুকূল বসন পরিহিতা,—অল্প আভরণে সজ্জিতা, দেখিয়া মনে হয় যেন উদয়োন্মুখ মুখচন্দ্রিকা লইয়া কতিপয় নক্ষত্রে ভূষিতা তুহিন-বিহীন মধুযামিনী। উদয়োন্মুখ চন্দ্রের আননে শোভাময়ী মধুযামিনীর সহিত শুভ্র দুকূল বসন পরিহিতা পরিমিত ভূষণা যুবতী নারীর রহস্যময়ী মূর্তি আমাদের বাসনার ভিতরে ডুবিয়া আছে এক হইয়া,—তাই কাব্যে সেই বাসনার রূপায়ণের ভিতরেও তাহাদিগকে আমরা পাই এমন অবিচ্ছিন্ন করিয়া। সহৃদয় পাঠকও এই সমধর্মা ছবি একের পর এক যত দেখিবেন, ততই আসিবে তাঁহার বাসনার ভিতরে স্পন্দন,—ততই হইবে তাঁহার অন্তরে রসোদ্রেক,—ততই হইবে তাঁহার কাব্যাস্বাদ সার্থক।

এই যে উপমার পর উপমা, উৎপ্রেক্ষার পর উৎপ্রেক্ষা, ব্যতিরেকের পর ব্যতিরেকের সমাবেশ করিয়া কবি সুন্দরী নারীর

দেহ-সুষমার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি কবির তৃপ্তি নাই, —তথাপি কবি কখনও একথা বলিতে পারেন না যে, সুন্দরী নারীর দর্শনে তাঁহার মনের রাজ্যে যে বাসনার নারীমূর্তিটি জাগিয়া ওঠে তাহাকে তিনি কখনও প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। কালিদাস পারেন নাই,—সমগ্র জগতের লক্ষ লক্ষ কবি একত্র হইয়াও তাহা পারেন নাই ; আজও তাই শত সহস্র নূতন নূতন উপমার সাহায্যে চলিয়াছে সেই একই চেষ্টা—অন্তরের সেই বাসনাময়ী নারীকে কোনও রূপে বাহিরে আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশ করা।

'রঘুবংশে' দেখিতে পাই, রামচন্দ্রকে প্রসব করিবার পর কৃশোদরী কৌশল্যা রামচন্দ্রকে শয্যার পাশে রাখিয়া শায়িত আছে ; দেখিয়া মনে হয়, শরতের ক্ষীণা জাহ্নবী যেন সৈকতের প্রস্ফুট পদ্মের উপহার সহ শোভা পাইতেছে।

শয্যাগতেন রামেণ মাতা শাতোদরী বভৌ।
সৈকতাম্ভোজবলিনা জাহ্নবীব শরৎকৃশা ॥ (১০।৬৯)

আঁকিয়া বাঁকিয়া বহিয়া যাওয়া শরতের ক্ষীণ স্রোতস্বিনীর শুভ্র সৈকতে ঈষৎ রক্তাভ প্রস্ফুট পদ্মকলিটি দেখিয়া কবি যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা যেন সদ্যঃপ্রসূত রক্তিমাভ শিশুটিকে বুকের কাছে রাখিয়া শুভ্র শয্যায় ক্ষীণ শিথিল অঙ্গ এলাইয়া দিয়া শায়িতা মাতৃমূর্তি হইতে লব্ধ আনন্দেরই সহোদর। সহৃদয় পাঠকচিত্তেও যদি সমজাতীয় বাসনা থাকে তবে পরস্পরসম্বদ্ধ দুইটি চিত্রে সেই বাসনা উদ্রিক্ত হইয়া তাহাকেও রসধারে আপ্লুত করিয়া দিবে।

'রঘুবংশে'র অন্যত্র দেখিতে পাই, শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে বলিতেছেন,—

আসার-সিক্ত-ক্ষিতি-বাষ্পযোগাৎ
মামক্ষিণোদ্ যত্র বিভিন্ন-কোশৈঃ।

বিড়ম্ব্যমানা নবকন্দলৈস্তে
•বিবাহধূমারুণ-লোচন-শ্রীঃ ॥ (১৩।২৯)

বর্ষার নববারিপাতে ধরণীর গাত্র হইতে জাগিয়া উঠিতেছে বাষ্পের ধূম, আর ধরণীর গায়ে দলগুলি ভিন্ন করিয়া বিকশিত হইয়াছে অরুণবর্ণের নবীন কন্দলী ফুল। ধরণীর গাত্র হইতে উত্থিত বাষ্পধূমে আবৃত অরুণবর্ণ নবদলভেদী কন্দলী ফুলগুলি দেখিয়া রামচন্দ্রের শুধু মনে পড়িতেছিল বিবাহের যজ্ঞধূমে অরুণাভ সীতার কোমলপক্ষ্মভেদী চক্ষু দুইটি। ধরণীর বাষ্পধূমে আবৃত এবং ঈষৎ-ক্লিষ্ট অরুণাভ কন্দলী ফুলগুলির ভিতরে একটা নবীন লাবণ্য—একটা রহস্যাবৃত মহিমা আসিয়াছে, কারণ, এই বাষ্পধূমের পশ্চাতে রহিয়াছে নবীন মেঘের নবতম বর্ষণ,—যাহা ধরণীর তৃষিত বুকে আনিয়াছে নবতম শীতল স্পর্শ,—যাহা সূচিত করিতেছে শ্রাবণের ঘনবর্ষণ—যাহাতে ধরণীর বুকে আনিবে নিবিড় শ্যামলতা—মাঠে মাঠে আনিবে নূতন শস্য—তরুলতায় আনিবে নবীন ফলফুল। বিবাহধূমে অরুণায়িত পক্ষ্মদ্বয়ের ভিতরে উন্মীলিত সীতার চক্ষুদ্বয়ের মধ্যেও রহিয়াছে এই জাতীয় একটা অপরূপ রহস্যময়ী শোভা,—একটা অকথিত মহিমা; কারণ বিবাহ-ধূমের পশ্চাতেও রহিয়াছে যে প্রেম-তৃষিত কুমারী জীবনের একটা নবতম তৃপ্তি,—তাহার ভিতরে সূচনা রহিয়াছে দাম্পত্য জীবনের ফলপুষ্প শোভিত পরিণতির। রামচন্দ্রের মনের ভিতরে এই দুইটি দৃশ্যই জাগায় সম-অনুভূতি,—একে তাই স্মরণ করাইয়া দেয় অপরকে।

কালিদাসের উপমায় প্রকৃতি ও মানুষের নৈকট্য

উপরে আলোচিত কালিদাসের উপমাগুলি লক্ষ্য করিলে আমরা একটা জিনিস দেখিতে পাইব, মানুষের রূপ ও গুণের বর্ণনা করিতে গিয়া কালিদাস তাহাকে যতটা পারেন প্রকৃতির সহিত তুলনা দিয়া দিয়া প্রকৃতির নিকটবর্তী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আবার অন্যদিকে লক্ষ্য করিতে পারি, প্রকৃতির নদনদী, পাহাড়-পর্বত, বন-উপবন, বৃক্ষলতা প্রভৃতির বর্ণনা করিতে গিয়া কবি তাহাদিগকে চেতন মানুষের রূপগুণ ও জীবনযাত্রার সাদৃশ্যে বর্ণনা করিয়া করিয়া প্রকৃতিকেও যতটা পারেন মানুষের নিকটবর্তী করিয়া তুলিয়াছেন। ইহা কালিদাসের একটা কবি-কৌশলের বৈশিষ্ট্য নয়—ইহার ভিতর দিয়া তাঁহার কবিধর্মেরই একটা বিরল বৈশিষ্ট্য সূচিত হইতেছে। কালিদাসের কাব্য সমগ্রভাবে বিচার করিলে একটা কথা খুব স্পষ্ট এবং প্রধান হইয়া দেখা দিবে,—তাহা এই যে কবির মনের মধ্যে বিশ্বসৃষ্টির ভিতরকার চিদ্-অচিদের ভেদরেখাটি যেন কোথাও স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে তিনি যেন অনেকখানি একটা অদ্বয়বাদে বিশ্বাসী ছিলেন। সেই মূল বিশ্বাসটিই যেন নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার উপমাগুলির ভিতরে মানুষ ও প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায়। 'কুমার-সম্ভবে' উমাসহ মা মেনকার যে শোভাতিশয়িতা কালিদাস তাহাকে প্রকাশ করিয়াছেন একটিমাত্র উপমায়—

তয়া দুহিত্রা সুতরাং সবিত্রী
স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলয়া চকাশে।
বিদূরভূমির্নবমেঘশব্দা-
দুদ্ভিন্নয়া রত্নশলাকয়েব॥ (১।২৪)

যাহার প্রভামণ্ডল চারিদিকে স্ফুরিত হইতেছিল এমন কন্যাসহ মাতা

মেনকা তেমনই শোভা পাইতেছিল—যেমন শোভা পায় একটি বিদূর-শৈলভূমি—নবমেঘশব্দের পরে উদ্ভিন্ন রত্নাঙ্কুর সহ।

'রঘুবংশে' নারায়ণের দেহসৌন্দর্য বর্ণনা করিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন, নারায়ণ তাঁহার দেহে বিস্তার করিয়া আছেন যে অংশুক, তরুণ অর্কের ন্যায় তাহার দীপ্তি—প্রবুদ্ধ রহিয়াছে তাঁহার যে নেত্র দুইটি তাহা যেন দুইটি সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কমল—এইভাবে সর্বাঙ্গে একটি শরৎ-প্রভাতের কান্তি বিস্তার করিয়া তিনি বিরাজমান।

প্রবুদ্ধপুণ্ডরীকাক্ষং বালাতপনিভাংশুকম্।
দিবসং শারদমিব প্রারম্ভসুখদর্শনম্॥ (১০।৯)

পূর্বের বহু উপমায় আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, নারী-সৌন্দর্যের বর্ণনা করিতে গিয়া কালিদাস কি করিয়া তাহাকে বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন রূপ-গুণের সহিত যুক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অন্যদিকে আবার লক্ষ্য করিতে পারি, প্রকৃতির বর্ণনা করিতে গিয়া তাহাকে কবি কি ভাবে নারীসৌন্দর্যের ছায়ায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাই বেত্রবতী নদীর চলোর্মিকে তিনি 'সভ্রূভঙ্গং মুখমিব' দেখিয়াছেন (পূর্বমেঘ, ২৪)। তারপরে নির্বিন্ধ্যা নদী—যে মেঘের প্রণয়িনীর ন্যায়—

বীচিক্ষোভস্তনিতবিহগশ্রেণিকাঞ্চীগুণায়াঃ
সংসর্পন্ত্যাঃ স্খলিতসুভগং দর্শিতাবর্তনাভেঃ। (পূর্বমেঘ, ২৮)

তরঙ্গক্ষোভের দ্বারা চঞ্চলবিহগগণই যাহার কাঞ্চীদাম—এবং জলের আবর্তই যাহার নাভি—এবং এই সমস্ত দ্বারাই যে হাবেভাবে মেঘকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিবে। হাবভাবের দ্বারা প্রণয়প্রকাশে সমুৎসুকা হইলেও এই নির্বিন্ধ্যা মেঘের বিরহে বিরহিণী,—

বেণীভূতপ্রতনুসলিলাসাবতীতস্য সিন্ধুঃ
পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরুভ্রংশিভির্জীর্ণপর্ণৈঃ। (ঐ, ২৯)

নির্বিন্ধ্যার জলপ্রবাহ একবেণীর ন্যায় কৃশ হইয়া গিয়াছে—তীরতরু হইতে খসিয়া পড়া জীর্ণপত্র সমূহের দ্বারা সে পাণ্ডুচ্ছায়া ধারণ করিয়াছে—এই সকলই তাহার বিরহের চিহ্ন। ইহার পরেই আছে শিপ্রা নদী ; সেই শিপ্রা নদী হইতে প্রবাহিত বাতাস হইল প্রার্থনা-চাটুকার প্রিয়তমের ন্যায়—'শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনাচাটুকারঃ'; তাহার সেই প্রার্থনাচাটুকারত্বের বর্ণনায় দেখি,—

দীর্ঘীকুর্বন্ পটু মদকলং কূজিতং সারসানাং
প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ। (ঐ, ৩১)

যে বাতাস প্রত্যূষে সারসের মধুরাস্ফুট মনোহর রবকে বিস্তার করিয়া এবং প্রস্ফুটিত পদ্মের গন্ধে সুগন্ধি হইয়া বেড়ায়।

তারপরে দেখিতে পাই ধীরা নায়িকা গম্ভীরা নদীর ছবি। যক্ষ মেঘকে বলিতেছে, এই গম্ভীরা নদীর বিমল জলের প্রসন্নচিত্তে ছায়ারূপে তুমি প্রবেশ লাভ করিবে ; তাহার কুমুদধবল চটুল শফরীর উদ্বর্তন রূপ দৃষ্টিপাতকে ব্যর্থ করা তোমার কিছুতেই উচিত হইবে না।

গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতসীব প্রসন্নে
ছায়াত্মাপি প্রকৃতিসুভগো লপ্স্যতে তে প্রবেশম্।
তস্মাদস্যাঃ কুমুদবিশদান্যর্হসি ত্বং ন ধৈর্যাৎ
মোঘীকর্তুং চটুলশফরোদ্বর্তনপ্রেক্ষিতানি॥ (ঐ, ৪০)

সেই গম্ভীরা নায়িকার নীল সলিলই হইল নীল তরল বসন, বেতস-শাখার সহিত যুক্ত হওয়াতে সেই সরিয়া যাওয়া নীল বসন যেন কিঞ্চিৎ করধৃতের ন্যায় মনে হইবে—আর সেই নীল বসন সরিয়া গেলে মুক্ত হইবে তাহার পুলিনরূপ জঘন দেশ।—

তস্যাঃ কিঞ্চিৎ করধৃতমিব প্রাপ্তবানীরশাখং
হৃত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতম্বম্। ইত্যাদি (ঐ, ৪১)

কৈলাসপর্বতে অবস্থিত অলকাপুরীর বর্ণনা দিতে গিয়া কবি 'মেঘদূতে' বলিয়াছেন,—

তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্তগঙ্গাদুকূলাং

ন ত্বং দৃষ্ট্বা ন পুনরলকাং জ্ঞাস্যসে কামচারিন্। (ঐ, ৬৩)

কৈলাস-পর্বতের ক্রোড়দেশে যে সুন্দরী অলকাপুরী, সে যেন প্রণয়ীর কোলে আত্ম-সমর্পিতা প্রণয়িনী,—আর সেই পাহাড়ের বুকে অলকাপুরীকে বেষ্টন করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া নামিয়াছে যে তুষার-ধবল-গঙ্গা যে যেন সেই প্রণয়িনীর বিগলিত দুকূল বস্ত্র। 'স্রস্তগঙ্গাদুকূলাম্' !

'ঋতুসংহারে'র শরৎ-বর্ণনার ভিতরে দেখিতে পাই,—

চঞ্চন্মনোজ্ঞশফরীরসনাকলাপাঃ

পর্যন্ত-সংস্থিতসিতাণ্ডজ-পঙ্‌ক্তিহারাঃ।

নদ্যো বিশালপুলিনান্তনিতম্ববিম্বা

মন্দং প্রয়ান্তি সমদাঃ প্রমদা ইবাদ্য॥ (৩)

শরতের নদী মদালসা মন্থরগামিনী নারী। চঞ্চল মনোহর শ্বেত শফরী গুলি যেন তাহার শ্বেত কাঞ্চীদাম,—দুই কূলে শ্বেত হংসমালা যেন কণ্ঠের হার,—আর বিশাল পুলিনদেশ যেন তাহার নিতম্ব। 'বিক্রমোর্বশী'র ভিতরেও দেখিতে পাই,—

তরঙ্গভ্রূভঙ্গা ক্ষুভিতবিহগ-শ্রেণিরশনা

বিকর্ষন্তী ফেনং বসনমিব সংরম্ভশিথিলম্।

যথাবিদ্ধং যাতি স্খলিতমভিসন্ধায় বহুশো

নদীভাবেনেয়ং ধ্রুবমসহনা সা পরিণতা॥ (৪।৭৩)

ক্রুদ্ধা মানিনী প্রিয়তমা আজ যেন এই নদীর রূপ ধারণ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। তরঙ্গমালা যেন তাহার ভ্রূভঙ্গ,—চঞ্চল বিহগশ্রেণী

তাহার কাঞ্চীদাম—ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ফেনপুঞ্জ যেন সেই ক্রোধ-কম্পিতাঙ্গীর স্খলিতপ্রায় বসন,—তাই হাত দিয়া ত্রস্তে যেন তাহা সংবরণ করিয়া লইতেছে। বন্ধুর পথে প্রতিহতা নদী যেন উচ্ছলবেগে ক্রোধে বেপথুমতী দয়িতার ন্যায়ই সবেগে চলিয়া যাইতেছে।

'রঘুবংশে' কালিদাস সৌধোপরি হইতে দৃষ্ট স্বর্ণাভচক্রবাক-মিথুন-খচিত আঁকাবাঁকা যমুনার বর্ণনা করিয়াছেন যেন ভূমির স্বর্ণখচিত এলায়িত বেণী।—

তত্র সৌধগতঃ পশ্যন্ যমুনাং চক্রবাকিনীম্।
হেমভক্তিমতীং ভূমেঃ প্রবেণীমিব পিপ্রিয়ে॥ (১৫।৩০)

'বিক্রমোর্বশী' নাটকে দেখি রাজা 'সেন্দ্রগোপং শাদ্বলং' অর্থাৎ ইন্দ্রগোপ ঘাসের সঙ্গে যুক্ত অচিরোদ্গত দূর্বাদলকে প্রিয়ার 'শুকোদরশ্যামং স্তনাংশুকম্' বলিয়া (৪।৩৪) ভুল করিয়াছেন।

'ঋতু-সংহারে' বর্ষাঋতুতে পৃথিবীর বর্ণনা করিতে কবি বলিয়াছেন—

প্রভিন্নবৈদূর্যনিভৈস্তৃণাঙ্কুরৈঃ
সমাচিতা প্রোত্থিতকন্দলীদলৈঃ।
বিভাতি শুক্লেতররত্নভূষিতা
বরাঙ্গনেব ক্ষিতিরিন্দ্রগোপকৈঃ॥ (৫)

দলিতবৈদূর্যমণির ন্যায় শ্যামল তৃণাঙ্কুরে, নবোদ্গত কন্দলীপত্রে এবং (বর্ষাকালজাত) ইন্দ্রগোপ তৃণে (অথবা ইন্দ্রগোপ কীটে) সমাবৃত হইয়া অশুক্লরত্নভূষিতা বরাঙ্গনার ন্যায় ক্ষিতি শোভা পাইতেছে।

বর্ষার আবিলস্রোতসমৃদ্ধা চঞ্চলা নদীর বর্ণনায় দেখি—

নিপাতয়ন্ত্যঃ পরিতস্তটদ্রুমান্
প্রবৃদ্ধবেগৈঃ সলিলৈরনির্মলৈঃ।

স্ত্রিয়ঃ সুদুষ্টা ইব জাতবিভ্রমাঃ
প্রয়ান্তি নদ্যস্তরিতং পয়োনিধিম্॥ (৭)

অনির্মল প্রবৃদ্ধবেগ সলিল সমূহের দ্বারা উভয়তীরবর্তী তটতরু গুলিকে নিপাতিত করিয়া নদীগুলি সুদুষ্টা স্ত্রীগণের ন্যায় জাতবিভ্রমা হইয়া সত্বর সমুদ্রের দিকে প্রধাবিত হইতেছে।

বর্ষায় বনান্তের বর্ণনায় দেখি, নবসলিলবর্ষণে বনান্তের সকল তাপ দূর হইয়া গিয়াছে,—গাছ ভরিয়া ফুটিয়া ওঠা কদম্বের দ্বারা তাহার আনন্দের অপূর্ব অভিব্যক্তি ; চারিদিকে গাছগুলির শাখা পবনের দ্বারা চালিত হইতেছে—যেন বনান্তের আনন্দনৃত্য ; আর কেতকীগুলির সূচিবৎ কিঞ্জল্কের দ্বারা বনান্ত আজ কতই না হাসিতেছে।—

মুদিত ইব কদম্বৈর্জাতপুষ্পৈঃ সমন্তাৎ
পবনচলিতশাখৈঃ শাখিভির্নৃত্যতীব।
হসিতমিব বিধত্তে সূচিভিঃ কেতকীনাং
নবসলিলনিষেকচ্ছিন্নতাপো বনান্তঃ॥ (২৩)

বর্ষার অত্যয়ে আগমন শরৎ-বধূর। সে যেন নববধূ। পরিধানে তাহার কাশের অংশুক, মুখখানি বিকশিত পদ্মে মনোজ্ঞ রূপ ধারণ করিয়াছে, সোন্মাদ হংসরবে তাহার রম্য নূপুরনাদ, আপক্কশালিধান্যের দ্বারা সে রুচিরা—তনু তাহার দেহযষ্টি—এইরূপই হইল রূপরম্যা শরতের নববধূবেশ।

কাশাংশুকা বিকচ-পদ্ম-মনোজ্ঞ-বক্ত্রা
সোন্মাদ হংসরব-নূপুর-নাদরম্যা।
আপক্ক-শালিরুচিরা তনুগাত্রযষ্টিঃ
প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রূপরম্যা॥ (১)

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে পারি, কালিদাস দুই উচ্চ ভূমির মধ্যে

প্রবাহিত নদীকে স্থানে স্থানে নারীর কণ্ঠে শোভিত মুক্তামালার সহিত তুলনা করিয়াছেন। 'মেঘদূতে' চর্মণ্বতীর বর্ণনায় দেখি—একং মুক্তাগুণমিব ভুবঃ স্থূলমধ্যেন্দ্রনীলম্ (৪৬)। 'রঘুবংশে' মন্দাকিনীর বর্ণনায় বলা হইয়াছে—

> এষা প্রসন্নস্তিমিতপ্রবাহা
> সরিদ্বিদূরান্তরভাবতন্বী।
> মন্দাকিনী ভাতি নগোপকণ্ঠে
> মুক্তাবলী কণ্ঠগতেব ভূমেঃ॥ (১৩।৪৮)

নগোপকণ্ঠে নদীধারার এই মুক্তাবলী রূপে বর্ণনার একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। দুই পর্বতশিখরের সহিত নারীর স্তনের উপমার সহিত মিলিত হইয়া নদীর এই মুক্তামালার উপমা পূর্ণতা লাভ করে। এই জন্যই নারীর বক্ষে দোলায়মান হারের সহিত দুই শিখরলগ্ন স্রোতস্বতীর উপমাও স্বাভাবিক ভাবেই আসে। তাহার আভাসও আছে কালিদাসের উপমায়। যেমন 'ঋতুসংহারে'র গ্রীষ্মবর্ণনায়—

> পয়োধরাশ্চন্দনপঙ্কচর্চিতা
> স্তুষার গৌরার্পিতহার-শেখরাঃ। (৬)

কালিদাসের উপমায় আনুপাতিক সম্বন্ধ

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, আমাদের স্মৃতির ভিতরেও একটা গভীরতার তারতম্য আছে। আমাদের সকল উপমাই যে বাসনার অতলতলে শিকড় গাড়িয়া আছে একথা বলা যায় না,—অনেক সময় হয়ত উপমা আসে আমাদের সাধারণ স্মৃতি হইতে। আমরা

দেখিয়াছি, সমজাতীয় বস্তুকে মনের ভিতরে বিধৃত করিয়া রাখিবার আমাদের মনের একটা ক্ষমতা আছে ; আবার আমাদের চিত্তবৃত্তির ভিতরে এমনও একটা ধর্ম রহিয়াছে যাহার ফলে একটি বস্তুর অনুভূতি তাহার সহিত যুক্ত অন্যান্য অনুভূতিগুলিকেও মনের ভিতরে জাগাইয়া তুলিতে পারে, ইহাকেই বলে স্মরণ। বহির্বস্তুর অনুভূতিগুলি যে শুধু বস্তু-সাদৃশ্যের ভিতর দিয়াই মনে বিধৃত থাকে এমন কথা বলা যায় না ; কার্য-কারণ, অঙ্গ-অঙ্গী, শেষ-শেষী প্রভৃতি রূপেও বস্তুর ভিতরে আছে যে পরস্পর সম্বন্ধ, সেই সূত্রেও বস্তুর অনুভূতি অনেক সময় আমাদের মনে এক হইয়া থাকে। বস্তুর ভিতরকার এই শেষোক্ত সম্বন্ধ সৃষ্টি করে অর্থান্তর-ন্যাস প্রভৃতি অলঙ্কারের।

বস্তু সম্বন্ধে দেহগত সাদৃশ্য ব্যতীত গুণকর্মের সাদৃশ্য দ্বারা তাহারা আমাদের মনের ভিতরে যখন যুক্ত থাকে তখন সর্বদাই তাহাদের ভিতরে থাকে একটা উপমান সম্বন্ধ (Relation of Analogy)। দুই বস্তুর গুণ বা কর্ম যেখানে সমজাতীয় সেইখানেই মনের ভিতরে তাহারা একত্রে গ্রথিত হইয়া থাকে তাহাদের রূপগত সকল বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও। এই জন্যই আলঙ্কারিকগণ উপমান এবং উপমেয়ের ভিতরে যে সাদৃশ্যের কথা বলিয়াছেন, তাহার নাম দিয়াছেন সাধর্ম্য বা সামান্য গুণ। 'কুমার-সম্ভবে' কালিদাস বলিলেন,—

> তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং
> মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ।
> স্থিরোপদেশামুপদেশকালে
> প্রপেদিরে প্রাক্তন-জন্ম-বিদ্যাঃ ॥ (১।৩০)

হংসমালা যেমন শরতের গঙ্গায় আপনি উড়িয়া আসে,—রজনীর মহৌষধিতে দীপ্তি যেমন স্বতঃ প্রকাশিত হয়,—তেমনই প্রাক্তন-জন্মের

বিদ্যা উপদেশকালে মেধাবিনী উমাকে আশ্রয় করিল। এখানে উপমাটিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব,—সমস্ত চিত্রগুলির ভিতরে যোগসূত্র দান করিয়াছে একটা অনুপাত সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধটিকে আমরা এইরূপে বিশ্লেষ করিতে পারি,—শরতের নদীর পক্ষে হংসমালা যাহা, রজনীর মহৌষধির পক্ষে স্বয়ংপ্রকাশ জ্যোতি যাহা, উপদেশ কালে মেধাবিনী উমার পক্ষে প্রাক্তন জন্মের বিদ্যার স্বতঃস্ফূর্তিও তাহাই। শরৎ-গঙ্গার সহিত হংসমালার যে সম্বন্ধ, জ্যোতির সহিত রজনীর ওষধীর যে সম্বন্ধ, মেধাবিনী উমার সহিত প্রাক্তনবিদ্যার সম্বন্ধ ঠিক তাহাই। গাণিতিক উপায়ে আমরা ইহাকে বলিতে পারি একটা আনুপাতিক সম্বন্ধ, এবং গাণিতিক সূত্রে তাহাকে আমরা প্রকাশ করিতে পারি এইরূপে—

শরতের গঙ্গা ঃ হংসমালা
রজনীর মহৌষধি ঃ আত্মভাস্ } ঃ ঃ উপদেশকালে স্থিরোপদেশা
উমা ঃ প্রাক্তন-জন্ম-বিদ্যা

এখানে উপমাটির সার্থকতা প্রধানতঃ নির্ভর করিবে এই আনুপাতিক সম্বন্ধের উপরে। এই সম্বন্ধটি যত নির্ভুল, যত সুষ্ঠু, যত সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে, উপমাটিও ততই সুন্দর হইবে। উপরের উদাহরণেই দেখিতেছি,—শরতের গঙ্গায় যে হংসমালা উড়িয়া আসে তাহা যেমন স্বাভাবিক নিয়মে,—রাত্রিতে ওষধির প্রজ্বলন যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, মেধাবিনী উমার চিত্তে প্রাক্তনবিদ্যাও তেমনই স্বতঃস্ফূর্ত। এখানে স্বাভাবিক বিধানে এই স্বতঃস্ফূর্তিই আনুপাতিক সম্বন্ধ। উমার চিত্তে প্রাক্তন বিদ্যার স্বতঃস্ফূর্তি শরতের গঙ্গায় হংসমালার আগমন এবং রজনীর ওষধিতে আত্মভাসের ভিতর দিয়া অতি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়াই উপমাটি সার্থক। এখানে আরও দেখিতে পাই,—এই আনুপাতিক সম্বন্ধটি ব্যতীতও শরতের গঙ্গার সহিত তন্বী

উমার এবং শুভ্র হংসমালা এবং ওষধির স্বয়ংদীপ্তির সহিত শুভ্রোজ্জ্বল বিদ্যার একটা সুকুমার সাদৃশ্য রহিয়াছে,—এই সাদৃশ্য-মাধুর্য এবং আনুপাতিক সম্বন্ধের সুষ্ঠুতা সমগ্র উপমাটিকে সার্থক-মহিমা দান করিয়াছে।

এই আনুপাতিক সম্বন্ধের প্রশ্নটি সাধারণ উপমার মধ্যেও লুক্কায়িত থাকে। 'রঘুবংশে' বাজকুমার অজের বর্ণনায় দেখি, ক্ষত্রিয় রাজকুমার অজ ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া তেজে আরও দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন, কারণ ক্ষাত্রতেজের সহিত ব্রাহ্মণ্য তেজের মিলন ঠিক যেন অগ্নির সহিত পবনের মিলন।

স বভূব দুরাসদঃ পরৈ-
গুর্রুণাথর্ববিদা কৃতক্রিয়ঃ।
পবনাগ্নিসমাগমো হ্যয়ং
সহিতং ব্রহ্ম যদস্ত্রতেজসা॥ (৮।৪)

এখানেও জিনিসটিকে গাণিতিক উপায়ে স্পষ্ট এইভাবে উপস্থাপিত করা যায়ঃ—

অস্ত্রতেজ বা ক্ষাত্রতেজ ঃ ব্রাহ্মণ্য তেজ ঃ ঃ অগ্নি ঃ পবন।

এই আনুপাতিক সম্বন্ধের ভিতরে মূলের মাহাত্ম্য যেখানে বড় হইয়া যায়, সেইখানেই হয় 'ব্যতিরেক, 'অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্য' প্রভৃতি অলঙ্কার। 'কুমার-সম্ভবে'ই দেখিতে পাই, বিবাহের পূর্বে পুরনারীগণ উমার গৌরবর্ণ অঙ্গে শুক্ল অগুরু মার্জনা করিয়া তাহাতে গোরোচনা দ্বারা পত্রাঙ্কিত করিয়া দিতেছে। উমার দেহে সেই গোরোচনার পত্রাঙ্কন শ্বেতসৈকতে চক্রবাকশোভিতা হইয়া প্রবাহিতা গঙ্গার লাবণ্যকেও হার মানাইয়াছিল।—

বিন্যস্তশুক্লাগুরু চক্রুরঙ্গং
গোরোচনা-পত্রবিভক্তমস্যাঃ।

সা চক্রবাকাঙ্কিতসৈকতায়া-
স্ত্রিস্রোতসঃ কান্তিমতীত্য তস্থৌ ॥ (৭।১৫)

এখানে দেখিতেছি, গৌরীর শুক্ল-অগুরুমার্জিত অঙ্গে গোরোচনার পত্রাঙ্কনের সম্বন্ধ এবং গঙ্গার শ্বেতসৈকতে চক্রবাকের সম্বন্ধের ভিতরেও কবি আবার তারতম্য করিয়াছেন,—'অতীত্য তস্থৌ'।

কালিদাসের উপমার চমৎকারিত্ব এই আনুপাতিক সম্বন্ধের নিপুণ সংস্থাপনে। রূপের সাদৃশ্যে, গুণকর্মের এই আনুপাতিক সম্বন্ধের নিপুণ সংস্থাপনে বক্তব্য বিষয়টি যেন মধুর হইতে মধুরতর, গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠে। বস্তুর সহিত বস্তুর বা ঘটনার সহিত ঘটনার সম্বন্ধের ভিতরে অনেক সময়েই এমন একটা চারুতা থাকে যে, তাহাকে এইজাতীয় নানারূপ আনুপাতিক সম্বন্ধের ভিতরে না ফেলিয়া যেন আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। উমা যখন মহাদেবের নিকটে প্রত্যাখ্যাতা হইয়া একেবারে মরমে মরিয়া গৃহে ফিরিয়া চলিতেছিল, তখন পিতা হিমালয় আসিয়া কন্যাকে বুকে তুলিয়া লইলেন।

সপদি মুকুলিতাক্ষীং রুদ্র-সংরম্ভভীত্যা
দুহিতরমনুকম্প্যামদ্রিরাদায় দোর্ভ্যাম্।
সুরগজ ইব বিভ্রৎ পদ্মিনীং দন্তলগ্নাং
প্রতিপথগতিরাসীদ্ বেগদীর্ঘীকৃতাঙ্গঃ ॥ (৩।৭৬)

হিমালয় হঠাৎ আসিয়া দুইবাহু প্রসারণ পূর্বক রুদ্রকোপানল ভয়ে নিমীলিত-নয়না অনুকম্পাযোগ্যা কন্যাকে তুলিয়া লইলেন, এবং সুরগজ যেমন দন্তলগ্ন নলিনীকে লইয়া গমন করে, সেইরূপই দীর্ঘপদবিক্ষেপে দেহ বিস্তৃত করিয়া প্রস্থান করিলেন। নগাধিরাজ হিমালয়ের দুই হাতে উমা যেন সুরগজের দন্তে লগ্না কমলিনী।

আনুপাতিক সম্বন্ধটির ভিতরে একটি সুমধুর কমনীয়তা আছে। কর্কশদেহ ধূসরবর্ণ বিরাট হস্তীটির দন্তে যেমন করিয়া ক্ষুদ্র কোমল কমলিনী শোভা পায়, হিমালয়ের ধূসর বন্ধুর বিরাট বক্ষে কোমলাঙ্গী তন্বী উমা তেমন করিয়াই শোভা পাইতেছিল। শুধু তাহাই নহে,—বলবান্ বিরাট হস্তীর যে শুণ্ডের আঘাতে বৃহৎ বনস্পতিগুলি মুহূর্তে ভগ্ন হইয়া যায়,—সমস্ত বন্য পশু যাহার ভয়ে ভীত ত্রস্ত, সেই ভীষণ বলবান্ হস্তীর ধূসর কর্কশ দেহের অভ্যন্তরে রহিয়াছে এমন একটা কোমল স্নেহ,—যে স্নেহের বশে সে অতিশয় কমনীয় কমলটিকেও এত যত্নে এবং আদরে শুণ্ডে করিয়া লয়, যাহাতে একটি কোমল পাপড়িতেও এতটুকু আঘাত লাগিতে না পারে,—বিরাট হিমালয়ের বুকে উমাও ঠিক তেমনই। যে বিরাট হিমালয় মুহূর্তে কত জনপদ নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে পারে,—দাবাগ্নিতে কত বনস্পতি, কত জীবজন্তু ধ্বংস করিয়া দিতে পারে, কত প্লাবন বহাইতে পারে, কত নদনদীর প্রবাহ বন্ধ করিয়া দিতে পারে,—তাহার বুকে পিতৃস্নেহের করুণা কত মধুর!

'রঘুবংশে' দেখিতে পাই,—স্বয়ংবর সভায় প্রতিহারিণী সুনন্দা রাজকন্যা ইন্দুমতীকে এক রাজকুমারের নিকট হইতে অন্য রাজকুমারের নিকটে লইয়া যাইতেছে। কবি বলিলেন,—

তাং সৈব বেত্র-গ্রহণে নিযুক্তা
রাজান্তরং রাজসুতাং নিনায়।
সমীরণোত্থেব তরঙ্গলেখা
পদ্মান্তরং মানসরাজহংসীম্॥ (৬।২৬)

বেত্রধারিণী প্রতিহারিণী রাজকন্যাকে এক রাজার নিকট হইতে অন্য রাজার নিকটে লইয়া যাইতেছিল,—যেমন সমীরণোত্থিত তরঙ্গলেখা

রাজহংসীকে পদ্ম হইতে পদ্মান্তরে লইয়া যায়। উপমাটিকে বিশ্লেষণ করিলে প্রথম সার্থকতা মনে হয় ইহার আনুপাতিক সম্বন্ধের সুষ্ঠুতায়। রাজকন্যাকে প্রতিহারিণী যে এক রাজকুমার হইতে অন্য রাজকুমারের নিকটে আগাইয়া দিতেছে, সে যেন সমীরণের মৃদু আঘাতে উত্থিত তরঙ্গের ঈষৎ আন্দোলনে মানস-বিহারিণী মরালীকে পদ্ম হইতে পদ্মান্তরে আগাইয়া দেওয়া। তারপরে 'রাজসুতা' ইন্দুমতী এখানে 'মানস-রাজহংসী'। সে যেন রাজন্যবর্গের মানসের নবতম প্রণয়াকাঙ্ক্ষা-নীরে রাজহংসীর ন্যায়ই বঙ্কিম ভঙ্গিতে ঈষৎলাস্যে বিচরণ করিতেছে—একটুখানি আনন্দলীলার চাঞ্চল্যে সে এখান হইতে ওখানে সরিয়া যাইতে পারে। নবযৌবনে প্রস্ফুট এক একটি রাজকুমার যেন এক একটি প্রস্ফুট পদ্ম। আর প্রতিহারিণীও এখানে সমীরণোত্থিত তরঙ্গলেখা; সে চলিয়াছে তাহার সখীজনোচিত আনন্দ, কৌতূহল ও ঈষৎ লাস্যে, তাই সে সমীরণোত্থিত তরঙ্গলেখা। এই আনুপাতিক সম্বন্ধ,—প্রতি বস্তুর এই গুণকর্ম এবং রূপের সাদৃশ্য,—সকল একত্রিত হইয়া জাগাইয়া তোলে একটি রমণীয় রসধ্বনি।

শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতাকে পুনরুদ্ধার করিয়া লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় ফিরিলেন তখন আনন্দোৎসবে সমগ্র অযোধ্যা নগরী ভরিয়া উঠিল। তখন—

> প্রাসাদ-কালাগুরুধূমরাজি-
> স্তস্যাঃ পুরো বায়ুবশেন ভিন্না।
> বনান্নিবৃত্তেন রঘূত্তমেন
> মুক্তা স্বয়ং বেণিরিবাবভাসে॥ (১৪।১২)

সেই অযোধ্যাপুরীর প্রাসাদ হইতে উত্থিত কৃষ্ণ অগুরুর ধূমরাশি বায়ুবশে ভিন্ন হইয়া যাইতেছিল; মনে হইতেছিল, বন হইতে

প্রত্যাবর্তন করিয়া রঘূত্তম রাম যেন স্বয়ং আসিয়া অযোধ্যা-সুন্দরীর কাল বেণী মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। রাজভোগ্যা রাজনগরীর সহিত রাজার সম্বন্ধটি কান্তাসম্মিত। রামচন্দ্র সুদীর্ঘ চতুর্দশ বর্ষের জন্য বনবাস গ্রহণ করিলে পর এই সুদীর্ঘ বিরহের ভিতরে অযোধ্যা নগরীতে আর কোন আনন্দোৎসব হয় নাই; ভরত সন্ন্যাসী, শত্রুঘ্ন সন্ন্যাসী, সমগ্র অযোধ্যা নগরীও যেন রামচন্দ্রের প্রতীক্ষায় 'ধৃতৈকবেণী' তপস্বিনী। আজ যেন রামচন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া আপন হস্তে সেই শ্বেত-সৌধ-বসনা 'ধৃতৈকবেণী' অযোধ্যার অগুরু সুরভিত কাল কেশদাম মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

সীতার বনবাসী শিশুপুত্রদ্বয় কুশ এবং লব মহর্ষি বাল্মীকির সহিত রাজসভায় আসিয়া বীণাযোগে রামায়ণ গান আরম্ভ করিল। কোমলকণ্ঠ শিশুদ্বয়ের সঙ্গীতের করুণ মাধুর্যে সমগ্র রাজসভা সজল নয়নে স্তব্ধ হইয়া গেল। কবি বলিলেন,

> তদ্‌গীতশ্রবণৈকাগ্রা সংসদশ্রুমুখী বভৌ।
> হিমনিষ্যন্দিনী প্রাতর্নির্বাতেব বনস্থলী॥ (১৫।৬৬)

সুমধুর বালকণ্ঠে গীত সেই করুণমধুর সঙ্গীত শুনিয়া সমাহিত নিঃস্পন্দ বিরাট সভা অশ্রুমুখী হইল, সে যেন শিশিরস্নিগ্ধ নির্বাত প্রভাতের নিস্তব্ধ বনস্থলী। সংসদের সেই অশ্রু যেন সঙ্গীত শ্রবণে যুগপৎ অসীম মাধুর্য এবং করুণায় বিগলিত চিত্তেরই নিস্তব্ধ ভাষা,—এমনিতর একটা অব্যক্ত করুণা এবং মাধুর্যেরই ভাষা প্রভাত-বনস্থলীর গায়ে স্বচ্ছশীতল শিশিরবিন্দু। সমাহিত নিঃস্পন্দ সংসদ্ যেন প্রভাতের নির্বাত বনস্থলী।

কালিদাসের প্রায় প্রত্যেকগুলি উপমারই বিশেষত্ব এই যে, উপমাগুলির ভিতরে একটা আশ্চর্য স্থিতিস্থাপকতা গুণ রহিয়াছে।

তাহাকে ডাইনে বাঁয়ে উর্ধ্বে অধে যতখানি টানা যায়, সে ততখানিই বাড়ে, সহসা ছিঁড়িয়া যায় না,—আবার ছাড়িয়া দিলেই আসিয়া সঙ্কুচিত হয় একটি চিত্রের ভিতরে। উপমাগুলির ভিতরে যেমন একটা আপাতমাধুর্য, অর্থের চমৎকারিত্ব রহিয়াছে, তেমনিই ইহাদের ভিতরে গর্ভিত হইয়া থাকে অনেকখানি সম্ভাবনা। সেই গর্ভিত সম্ভাবনার অস্ফুট আভাস স্পষ্ট অর্থকে আরও গভীরতা আরও রহস্য দান করে। "কিঞ্চিৎপরিলুপ্তধৈর্যঃ" মহাদেবকে কালিদাস যেখানে 'চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ'-র সঙ্গে তুলনা করিলেন, তখন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে মহাদেবের যোগসমাহিত চিত্তে সমুদ্রবক্ষের ঈষৎ চাঞ্চল্য; কিন্তু এই সমুদ্রের সহিত মহাদেবের তুলনার ভিতরে গর্ভিত হইয়া আছে আরও অনেকখানি কথা। মহাদেবের চিত্ত এমনই বিরাট যে, সমুদ্রবক্ষের মত সে যেমন ঈষৎ উদ্বেলও হইতে পারে, আবার সমুদ্রের মতনই ভীষণ রুদ্রমূর্তিও ধারণ করিতে পারে; মহাদেবের বিক্ষুব্ধ চিত্তের সেই সমুদ্রসম প্রচণ্ডাঘাতেও মুহূর্তে সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি ত্রস্ত হইয়া উঠিতে পারে। এই গর্ভিত সম্ভাবনাকে পশ্চাতে রাখিয়াই মহাদেবের চিত্তের ঈষৎ উদ্বেলতা এখানে এতখানি সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। কালিদাস যেখানে আসন্নপ্রসবা সুদক্ষিণাকে 'প্রভাত-কল্পা শশিনেব শর্বরী' বলিলেন, সেখানে যে তিনি প্রভাতকল্পা শর্বরীর পাণ্ডুতার সহিত গর্ভিণী সুদক্ষিণার পাণ্ডুতারই তুলনা করিয়াছেন তাহা নহে,—সেই প্রভাতকল্পা শর্বরীর ভিতরে বিশ্ব-উজ্জ্বলকারী প্রভাত-সূর্যের আসন্ন উদয় যেমন গর্ভিত রহিয়া প্রভাতকল্পা শর্বরীর সেই পাণ্ডুতাকেই একটা বিরাট মহিমা দান করে, সুদক্ষিণার পাণ্ডুতার ভিতরেও রহিয়াছে সেই আসন্ন-মাতৃত্বের মহিমা। শকুন্তলাকে যেখানে অনাঘ্রাত ফুল, অচ্ছিন্ন কিশলয়, অনাবিদ্ধ রত্ন, অনাস্বাদিতরস মধু বলা হইয়াছে, সেখানে

শকুন্তলার অস্পৃষ্ট অপরিভুক্ত কুমারীত্বই যে সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নহে, তাহার পশ্চাতে জাগিয়া উঠিয়াছে কুমারী শকুন্তলার অনবদ্য ভোগযোগ্যত্ব,—সে তখনও বিশ্বের কামনার বস্তু। কালিদাসের প্রায় প্রত্যেক উপমার ভিতরেই রহিয়াছে এই জাতীয় একটা স্থিতি-স্থাপকতা গুণ। অতি ছোট ছোট উপমাগুলির ভিতরেও এই যে একটা প্রচ্ছন্ন মহিমা, এই যে কিছু-বলার ভিতরে আবার কিছু-না-বলা কথা তাহা পাঠক-চিত্তকে সহজেই আকৃষ্ট করে।

কালিদাসের উপমায় ঔচিত্য

কালিদাসের উপমার এই স্থিতিস্থাপকতা গুণের আলোচনা প্রসঙ্গেই লক্ষণীয় কালিদাসের উপমার 'ঔচিত্য'। দেশকাল পাত্রের সমস্ত অবস্থানের সহিত মিলাইয়া দিয়া শ্লোকের আনাচে কানাচে এমন অর্থ ভরিয়া দিতে কালিদাস অদ্বিতীয়। আমরা কালিদাসের যে-সকল শ্লোক লইয়া উপরে আলোচনা করিয়াছি, তাহার প্রায় প্রত্যেকটির ভিতরেই দেখিতে পাইব এই দেশ-কাল-পাত্রের নিপুণ সমাবেশ।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের ভিতরে একদল 'ঔচিত্যবাদী' আছেন। তাঁহারা বলেন যে বাক্যের 'ঔচিত্য', অর্থাৎ দেশ-কাল-পাত্র প্রভৃতি সকল দিক দিয়া বিচার করিয়া বাক্যের যে সুষ্ঠুতম প্রয়োগ, তাহাই কাব্যের কাব্যত্ব। বাক্যের এই 'ঔচিত্যে'র ভিতর দিয়াই সে গ্রহণ করে একটা অনন্যসাধারণ রমণীয়তা,—তাহাই কাব্যের প্রাণবস্তু। এই মতটি সম্পূর্ণ গ্রহণীয় না হইলেও ইহার ভিতরে বেশ ভাবিবার কথা আছে। সমস্ত দিক দিয়া বিচার করিলে যাহা উচিত বোধ হয়, মনের

সেই ঔচিত্য-বোধ এবং সঙ্গতি বা সুষমা-বোধের সঙ্গে সৌন্দর্য-বোধের একটা নিগূঢ় সংযোগ রহিয়াছে; কারণ সৌন্দর্য-বোধের মূলেও রহিয়াছে সঙ্গতি বা সুষমা। এই ঔচিত্যমতে বিচার করিলে কালিদাসের উপমাগুলি যে তাঁহার কাব্যে কত প্রধান হইয়া উঠিয়াছে তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়।

শকুন্তলা নাটকে দেখিতে পাই, মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া আকাশবাণীতে দুষ্যন্তের সহিত শকুন্তলার সকল প্রণয়কাহিনী জানিতে পারিলেন। প্রিয়ংবদার মুখে জানিতে পাই, মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে কোলের কাছে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন,—'ধূমাউলিদদিট্‌ঠিণো বি জজমাণস্‌স পাবএ আহুই পড়িদা'—অর্থাৎ যজ্ঞীয় ধূমের দ্বারা আকুলিতদৃষ্টি যাজ্ঞিকের ঘৃতাহুতিও অগ্নিতেই পড়িয়াছে। আশ্রমপালিতা আশ্রমকন্যা হইলেও শকুন্তলা তাহার যোগ্য স্বামীই লাভ করিয়াছে। এখানে আর কালিদাস নবমালিকা এবং সহকারের মিলনের দৃশ্যটি আনিলেন না,—আশ্রমপালিতা শকুন্তলা এখানে ধূমাকুলিতদৃষ্টি যাজ্ঞিকের হস্তের ঘৃতাহুতি,—রাজা দুষ্যন্ত এখানে যজ্ঞীয় অগ্নি। এইখানেই কালিদাসের নিপুণ মাত্রা জ্ঞান,—এইখানেই তাঁহার দেশ-কাল-পাত্রের অটুট বিচার। এখানে বক্তা মহর্ষি কণ্ব,—স্থান তাঁহার তপোবন,—সুতরাং সেখানে শকুন্তলা এবং দুষ্যন্ত যজ্ঞের হবি এবং অগ্নি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এই দেশ-কাল-পাত্রের সহিত নিবিড় সঙ্গতি দ্বারাই বক্তব্যটি এত মধুর হইয়া ওঠে।

'দেবতাত্মা' নগাধিরাজ হিমালয়ের উমা সম্বন্ধেও সেই কথা দেখিতে পাই,—

ঋতে কৃশানোর্ন হি মন্ত্রপূত-
মর্হন্তি তেজাংস্যপরাণি হব্যম্॥ (১।৫১)

'মন্ত্রপূত হবি কখনও অগ্নি ব্যতীত অন্য কোন তেজোবস্তুতে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে না।' উমাও সেইরূপ মহাদেব ব্যতীত আর কাহারও নিকটে অর্পিতা হইতে পারে না।

মহর্ষি কণ্ব আবার যেখানে পিতা সেখানে তাঁহার উক্তির ভিতর দিয়া আবার পিতৃত্ব ক্ষরিয়া পড়িতেছে। শকুন্তলাকে আর্যা গৌতমী এবং ঋষিগণের সহিত পতিগৃহে পাঠাইয়া দিয়া ব্যথিত কণ্ব কহিলেন,—স্নেহপ্রবৃত্তি ঠিক এই রকমই ; তবু যাক, আজ শকুন্তলাকে পাঠাইয়া দিয়া আমি যেন এখন পুনরায় স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলাম ; কারণ, কুমারী কন্যা যেন পিতার নিকটে পরের ন্যস্ত ধন,—যতক্ষণ পর্যন্ত আবার প্রত্যর্পণ করা না যায়,—ততক্ষণই যেন আর সোয়াস্তি নাই ; সেই পরন্যস্ত ধন শকুন্তলাকে আজ পতিগৃহে পাঠাইয়া দিয়া আমিও নিশ্চিন্ত এবং নিরুদ্বেগ হইলাম।

অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব
তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং
প্রত্যর্পিত-ন্যাস ইবান্তরাত্মা ॥

গৌতমী এবং শার্ঙ্গরব প্রভৃতি ঋষি সমভিব্যাহারে শকুন্তলা যেদিন দুষ্যন্তের রাজসভায় উপস্থিত হইল তখন শার্ঙ্গরব রাজা দুষ্যন্তকে বলিয়াছিলেন,—

ত্বমর্হতাং প্রাগ্রহরঃ স্মৃতোঽসি নঃ
শকুন্তলা মূর্তিমতী চ সৎক্রিয়া।

'তুমি যেমন শ্রদ্ধার্হ লোকগণের অগ্রগণ্য, আমাদের শকুন্তলাও ঠিক তেমনই মূর্তিমতী সৎক্রিয়া।' শার্ঙ্গরব একথা বলিলেন না,—'হে রাজন্, তুমি যেমন সুচতুর মধুকর, আমাদের শকুন্তলাও তেমনই

মধুভরা অনাঘ্রাত পুষ্প'। যৌবনোন্মত্ত রাজা দুষ্যন্তের নিকটে যে শকুন্তলা একদিন ছিল অনাঘ্রাত পুষ্প, নখদ্বারা অচ্ছিন্ন কিশলয়, অনাবিদ্ধ রত্ন, অনাস্বাদিতরস মধু, শার্ঙ্গরবের বর্ণনায় সেই শকুন্তলাই 'মূর্তিমতী সৎক্রিয়া'। নারীর পার্থিব রূপ আঁকিতে কালিদাস মর্ত্যের মাটিত কতই ঘাটিয়াছেন,—কিন্তু মহর্ষি বাল্মীকির সহিত সীতা যেদিন শিশু-পুত্রদ্বয় সহ রামের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে সেদিন সীতা নবোদিত সূর্যের সম্মুখে ঋষি-কণ্ঠের গায়ত্রী!

রাজা রঘু যেদিন বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্বস্ব দান করিয়া শুধু দেহমাত্রে অবস্থান করিতেছিলেন, সেদিন বনের ঋষিগণ বলিয়াছিলেন,—

শরীরমাত্রেণ নরেন্দ্র তিষ্ঠন্
আভাসি তীর্থপ্রতিপাদিতর্দ্ধিঃ।
আরণ্যকোপাত্ত-ফল-প্রসূতিঃ
স্তম্বেন নীবার ইবাবশিষ্টঃ॥ (৫।১৫)

'মহারাজ, সমস্ত ধনরাশি উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করিয়া আপনি শুধু দেহাবশিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছেন; আরণ্যক ঋষিগণ সমস্ত শস্য তুলিয়া লইয়া গেলে নীবার যেমন স্তম্বমাত্রে অবশিষ্ট থাকে, আপনিও আজ সেইরূপ।' ধন-সম্পদ্ বিলাইয়া দিয়া রাজা রঘু আজ মুনিদের নিকটে শস্যহীন স্তম্বে অবশিষ্ট নীবার। বনের ঋষিগণ আর কোথায় উপমা পাইবেন? সম্পদ্‌হীন রাজার প্রতিমূর্তি তাঁহারা দেখিয়াছেন শস্যহীন স্তম্বাবিশিষ্ট নীবারে।

কালিদাসের উপমার বৈচিত্র্য ও বিরাটত্ব

কালিদাসের কাব্যে উপমা রহিয়াছে প্রায় প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে। সেই সকল উপমার ভিতরে কতকগুলি হয়ত অন্য কবির পক্ষেও সম্ভব হইত ; কিন্তু কালিদাসের উপমার ভিতরে এমন অনেকগুলি উপমা রহিয়াছে, যাহা কালিদাসের নামে একেবারে শীলমোহর করা। শুধু স্থিতিস্থাপকতা-গুণে নহে,—কালিদাসের উপমার বৈশিষ্ট্য তাঁহার অনুভূতির সূক্ষ্মতায়, গভীরতায় এবং বিরাটত্বে, তাঁহার কল্পনার সূক্ষ্মতায়, বিপুলতায় এবং বৈচিত্র্যে। একদিকে দেখিতে পাই, সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি তাহার সকল চন্দ্রসূর্য, গ্রহনক্ষত্র, গিরিনদী, তরুলতা, ফলপুষ্প, পশুপক্ষী লইয়া, এবং মানুষ, তাহার রূপের সকল সূক্ষ্ম সৌষম্য, তাহার জীবনের সকল সুখদুঃখ, ভালমন্দ, হাসিকান্না, বিরহ-বিচ্ছেদ—সকল বৈচিত্র্য লইয়া কবির মনের ভিতরে নিবিড় ভাবে যেন একান্ত বাস্তবরূপে বাসা বাঁধিয়া আছে ; অন্যদিকে আবার দেখিতে পাই কল্পনা-শক্তির সাবল্যে মুহূর্তে পাঠকের নিকটে সেই মনের জগৎকে একান্ত প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিবারও অসীম শক্তি রহিয়াছে কবির ভিতরে। এই আদান-প্রদানের নিজস্বতার ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে কবি-প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য। কবির দর্শনশক্তি এবং শ্রবণশক্তির ভিতরে একটা বিশিষ্ট স্বাধীন ভঙ্গি ছিল, সেই স্বাধীন চিন্তাধারাকে কবি স্বাধীন কল্পনার পক্ষে নিঃসীম শূন্যে মুক্তি দিয়াছেন,—স্বচ্ছন্দ তাহার গতি,—বিপুল তাহার পরিধি।

পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি, কবিকে স্বভাবতই তাঁহার বক্তব্য অনেকখানি বাড়াইয়া বলিতে হয় ; কারণ যে অনুভূতি কবির কাছে প্রত্যক্ষ,—পাঠকের নিকট তাহা পরোক্ষ ; তাই পাঠকেব নিকটে অনেকখানি বাড়াইয়া তুলিতে না পারিলে পাঠক রসের সমগ্রতাকে

লাভ করিতে পারে না। সাহিত্যে যে আমাদের মনের সূক্ষ্ম রসানুভূতিগুলিকেই অপরের নিকটে বাড়াইয়া বলিতে হয় তাহা নহে,—প্রাকৃতিক স্থূল বস্তুকেও অনেকখানি বাড়াইয়া বলিয়া অপরের নিকটে তাহার স্বরূপের পরিচয় দিতে হয়।

নিজের মনের ভাবকে বাহিরে কতখানি বাড়াইয়া বলিলে পাঠক কবি-মানসের সন্ধান পাইতে পারে, কবি-অনুভূতির সকল সূক্ষ্ম সৌকুমার্য এবং বৈচিত্র্য, তাহার গাম্ভীর্য এবং বিরাটত্ব অপরের নিকটে ধরা পড়িতে পারে এ জিনিসটি কালিদাসের অতি নিপুণভাবে জানা ছিল। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, যোগভগ্ন মহাদেবের ঈষৎ চিত্তচাঞ্চল্যকে কবি কেমন করিয়া ভাষা দিয়াছেন, রঘুরাজের প্রসবিত্রী রাণী সুদক্ষিণার মূর্তিকে কবি কেমন করিয়া প্রভাতকল্পা শর্বরীর রূপ দিয়াছেন। এই গর্ভিণী সুদক্ষিণা সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে,—

নিধানগর্ভামিব সাগরাম্বরাং
শমীমিবাভ্যন্তর-লীন-পাবকাম্।
নদীমিবান্তঃসলিলাং সরস্বতীং
নৃপঃ সসত্ত্বাং মহিষীমমন্যত॥ (৩।৯)

অন্তঃসত্ত্বা মহিষীকে রাজা দিলীপ সাগরাম্বরা রত্নগর্ভা বসুন্ধরার ন্যায়, অগ্নিগর্ভা শমীর ন্যায় এবং অন্তঃসলিলা সরস্বতী নদীর ন্যায় মনে করিতেন।

রোরুদ্যমানা শকুন্তলা যখন আশ্রম ছাড়িয়া পতিগৃহে যাত্রা করিতেছে, তখন মহর্ষি কণ্বও বলিয়াছিলেন,—

তনয়মচিরাৎ প্রাচীবার্কং প্রসূয় চ পাবনং
মম বিরহজং ন ত্বং বৎসে শুচং গণয়িষ্যসি॥

'হে বৎসে, পূর্বদিক্ যেমন সূর্যকে প্রসব করে, তেমনই অচিরে একটি

পুত্র প্রসব করিয়া তুমি আমার বিরহ-জনিত শোক আর গণনা করিবে না।' শকুন্তলা শীঘ্রই এমন পুত্র প্রসব করিবে যাহার নামে এই বিশাল সাম্রাজ্য ভারতবর্ষ বিখ্যাত হইয়া থাকিবে,—এমন পুত্রকে প্রসব যেন 'প্রাচীবার্কং প্রসূয়' ! শকুন্তলা নাটকের চতুর্থ অঙ্কেও দেখিতে পাই,—শকুলন্তা সম্বন্ধে মহর্ষি কণ্বের নিকটে আকাশবাণী হইয়াছে,—

অবেহি তনয়াং ব্রহ্মন্নগ্নিগর্ভাং শমীমিব ॥

'হে ব্রাহ্মণ, তুমি তোমার এই তনয়াকে অগ্নিগর্ভা শমীর ন্যায় জানিও।' গর্ভবতী শকুন্তলা আজ 'অগ্নিগর্ভা শমী' !

'মেঘদূতে'র ভিতরে দেখিতে পাই, যক্ষ মেঘের নিকটে কৈলাস পর্বতের পরিচয় দিতেছে,—

গত্বা চোর্ধ্বং দশমুখভুজোচ্ছাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈ র্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ॥ (পূ।৫৮)

'হে মেঘ, ঊর্ধ্বদিকে গমন করিয়া, রাবণের ভুজ দ্বারা বিভক্তসন্ধি এবং দেববনিতাগণের দর্পণ স্বরূপ কৈলাস পর্বতের অতিথি হইবে ; যে কৈলাস কুমুদের ন্যায় শুভ্রবর্ণ উচ্চ শৃঙ্গসমূহের দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া প্রত্যহ মহাদেবের পুঞ্জীভূত অট্টহাসের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। শুভ্রতুষারকিরীটিনী শুভ্র সৌরকরে প্রদীপ্ত অভ্রভেদী কৈলাসের শৃঙ্গগুলি যেন মহাকালের অধীশ্বর দেবাদিদেব ত্র্যম্বকের প্রতিদিনের পুঞ্জীভূত অট্টহাসি !'

'মেঘদূতে'র অন্যত্র দেখি, যক্ষ মেঘকে বলিতেছে,—সন্ধ্যাবেলা মহাকাল মহাদেব তাঁহার তাণ্ডবনৃত্যে উৎসুক হন ; এই তাণ্ডব নৃত্যের

প্রারম্ভে তিনি তাঁহার বিশাল দশবাহু ঊর্ধ্বে প্রসারিত করেন রক্তার্দ্র-গজচর্মের জন্য ; এই রক্তার্দ্রগজচর্ম স্বাভাবিকই ভবানীর ভাল লাগে না ; ভয় উদ্রেক করে ; সে ক্ষেত্রে হে মেঘ, তুমি যদি সন্ধ্যাবেলায় মহাদেবের ঊর্ধ্ব-প্রসারিত দীর্ঘবনস্পতিরূপ বাহুগুলির ঠিক উপরিভাগে অভিনব জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া মণ্ডলাকারে অবস্থান কর, তবে মহাদেবও আরও রক্তাক্তগজচর্মের জন্য হস্ত প্রসারণে উৎসুক হইবেন না—ভবানীও শান্তভাবে নিশ্চলনেত্রে তোমার ভক্তি দর্শন করিতে থাকিবেন।

পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ।
নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং
শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা॥ (পূর্বমেঘ, ৩৬)

এখানে মহাকালের ঊর্ধ্বে প্রসারিত বনতরুরূপ কররাজি এবং তাহারই সংলগ্ন সন্ধ্যাসূর্যের রক্তচ্ছবি প্রতিফলিত করিয়া মেঘের রক্তাক্ত গজাজিন রূপ সত্যই অপূর্ব চমৎকৃতি লাভ করিয়াছে।

'পূর্বমেঘে'র আর একটি শ্লোকে দেখি,—

আসীনানাং সুরভিতশিলং নাভিগন্ধৈর্মৃগাণাং
তস্যা এব প্রভবমচলং প্রাপ্য গৌরং তুষারৈঃ।
বক্ষ্যস্যধ্বশ্রমবিনয়নে তস্য শৃঙ্গে নিষণ্ণঃ
শোভাং শুভ্রত্রিনয়নবৃষোৎখাতপঙ্কোপমেয়াম্॥
(পূর্বমেঘ, ৫২)

হিমালয়ের যে প্রদেশ হইতে গঙ্গার উৎপত্তি, ধবল তুষারাবৃত সেই শিলাভূমিই হইল ত্রিনয়ন মহাদেবের শুভ্র বৃষটি ; সেই প্রদেশে হিমালয়ের যে শিখর তাহা হইল মহাদেবের সেই তুষারধবল বৃষের

শৃঙ্গ ; আর সেই শিখরে নিষণ্ণ যে ঈষৎ কালো মেঘ তাহাই হইল যেন সেই বৃষের শৃঙ্গোৎখাতে উত্তোলিত কর্দম ! মহাদেবের বিরাটত্বের সহিত তাঁহার বৃষটি—বৃষের শৃঙ্গ—এবং সেই শৃঙ্গের কর্দমের বিরাটত্ব সব মিলিয়া এখানে একটি বিরাট্ মহিমা ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে। এই মেঘকে অন্যত্র আবার যক্ষ উন্নত-অবনত হইয়া অভ্যন্তরস্থ জলরাশিকে নিস্তব্ধ করিয়া পাষাণবৎ দৃঢ়ীভূত হইয়া হরগৌরীর মণিময় তটে আরোহণের নিমিত্ত সোপানের কাজ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছে।—

ভঙ্গীভক্ত্যা বিরচিতবপুঃ স্তম্ভিতান্তর্জলৌঘঃ
সোপানত্বং কুরু মণিতটারোহণায়াগ্রযায়ী ॥ (৬০)

'ঋতু-সংহার' কাব্যে শরৎ-বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন,—

ব্যোম ক্বচিদ্রজত-শঙ্খ-মৃণাল-গৌরৈ-
স্ত্যক্তাম্বুভির্লঘুতয়া শতশঃ প্রয়াতৈঃ।
সংলক্ষ্যতে পবন-বেগ-চলৈঃ পয়োদৈ
রাজেব চামর-বরৈরুপবীজ্যমানঃ ॥ (৪)

শরতের বারিহীন রজত-শঙ্খ-মৃণালের ন্যায় শুভ্র লঘু মেঘগুলি পবনবেগে যেন শত সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ইতস্তত চালিত হইতেছে, দেখিয়া মনে হয়, ব্যোমরূপী মহারাজ যেন শুভ্র মেঘের অসংখ্য চামরের দ্বারা উপবীজ্যমান !

কালিদাসের এই জাতীয় উপমার ভিতরে বর্ণিত বিষয়ই যে তাহার সকল বিরাটত্ব এবং মহত্ত্ব লইয়া পরিস্ফুট হইয়া ওঠে তাহা নহে,—ইহা পাঠকের মনকেও দেয় একটা বিরাট মুক্তি,—তাহার চিরপরিচিত পারিপার্শ্বিকতার সীমাবদ্ধতা হইতে,—এমন কি কাব্যের বিষয়বস্তু হইতেও। কাব্যের দিক্ হইতে বিচার করিলে বলা যায়,—এইজাতীয়

উপমাগুলি যেন তাঁহার কাব্যের মধ্যে বাতায়ন-স্বরূপ। ইহার ভিতর দিয়া বর্ণিত বিষয় বা ঘটনার মধ্যে এক ফাঁকে যেন বাহিরের সীমাহীন আকাশ—সাগর-পর্বত আলো-বাতাস আসিয়া উঁকি মারিয়া যায়,—মন পায় মুক্তি,—সে ওঠে নবীন সরসতায় ভরিয়া। অথচ কল্পনার এই মুক্তির সহিত কাব্যের মূল প্রসঙ্গের যে কোনও যোগ নাই তাহা নহে, উপমেয়ের সহিত নিগূঢ় যোগ-সূত্রে এই উপমান গুলিরও কাব্যের মূল সুরের সহিত রহিয়াছে একটি অখণ্ড যোগ ; সেই অখণ্ড যোগের ভিতরেই তাহারা আবার আনে চিত্তের মুক্তি,—এইখানেই তাহাদের বিশেষত্ব।

'বিক্রমোর্বশী' নাটকে দেখিতে পাই,—

উদয়-গূঢ়-শশাঙ্ক-মরীচিভি-
স্তমসি দূরমিতঃ প্রতিসারিতে।
অলক-সংযমনাদিব লোচনে
হরতি মে হরিবাহনদিঙ্মুখম্ ॥

চন্দ্র এখনও উদিত হয় নাই,—এখনও 'উদয়-গূঢ়' ; সেই উদয়-গূঢ় চন্দ্রের উদ্ভাসে অন্ধকাররাশি দূরে প্রতিসারিত হইলে মনে হইল, যেন মুখের উপর হইতে অলকভার সংযমন করিলে পর দিগ্বধূর মুখখানি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। চন্দ্রের উদয়গূঢ় উদ্ভাসই যেন দিগ্বধূর সৌম্যোজ্জ্বল মুখকান্তি,—অন্ধকাররাশি যেন তাহার অলকভার। 'বিক্রমোর্বশী' নাটকেই অন্যত্র রাজা বলিতেছেন,—

'বিদ্যুল্লেখা-কনক-রুচির-শ্রীর্বিতানং মমা-ভ্রো'—বিদ্যুৎলেখার কনক-সূত্রে যেন মাথার উপরে ঘন মেঘের চন্দ্রাতপ টাঙান হইয়াছে !

'রঘুবংশে'র ভিতরে দেখিতে পাই,—রাজা দিলীপ পুত্রলাভের মানসে রাণী সুদক্ষিণাকে সঙ্গে করিয়া বশিষ্ঠের তপোবন অভিমুখে

রথে যাত্রা করিলেন। ঊর্ধ্বে নীল আকাশের গায়ে শুভ্র বলাকাশ্রেণী ঈষৎ উন্নমিত এবং অবনমিত হইয়া চলিতেছে,

শ্রেণীবন্ধাদ্-বিতন্বদ্ভি-রস্তম্ভাং তোরণ-স্রজম্।
সারসৈঃ কলনির্হ্রাদৈঃ ক্বচিদুন্নমিতাননৌ॥ (১।৪১)

কল-নিনাদে আকাশ ভরিয়া দিয়া সেই শুভ্র সারস-মালা যেন অস্তম্ভ তোরণ-মালার ন্যায় বাতাসে উড়িতেছিল,—রাজা ও রাণী উভয়েই মুখ বাহির করিয়া তাহা দেখিতেছিলেন। তারপরে আবার দ্বিতীয় সর্গে দেখিতে পাই,—সন্ধ্যাসমাগমে বশিষ্ঠঋষির হোমধেনু নন্দিনী বনান্তর হইতে পুনরায় আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছে, সেই পল্লব-স্নিগ্ধা পাটলবর্ণা নন্দিনীর ললাটে ঈষৎ কুঞ্চিত শ্বেতরোমরাজির অঙ্কন যেন পাটলবর্ণা সন্ধ্যার আকাশভালে নবোদিত চন্দ্রের টিপ।

ললাটোদয়মাভুগ্নং পল্লব-স্নিগ্ধ-পাটলা।
বিভ্রতী শ্বেতরোমাঙ্কং সন্ধ্যেব শশিনং নবম্॥ (১।৮৩)

এখানে এবং ইহার পরবর্তী কতগুলি বর্ণনায় আমরা ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের হোমধেনু নন্দিনী সম্বন্ধে কতগুলি উপমা দেখিতে পাই। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে, এই নন্দিনী একদিকে যেমন বশিষ্ঠের হোমধেনু—অন্যদিকে তেমনই রাজা দিলীপের সেব্যা; কালিদাসকে তাই নানাভাবে এই হোমধেনু নন্দিনীকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিতে হইয়াছে। বশিষ্ঠ বন্য ফলমূল আহার করিয়া সেইভাবেই রাজা দিলীপকে নন্দিনীকে সেবার দ্বারা তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে বলিলেন, যেমন চেষ্টা করেন শুচিব্রত কোনও জ্ঞানসাধক অভ্যাসের দ্বারা বিদ্যাকে প্রসন্না করিতে।—

বন্যবৃত্তিরিমাং শশ্বদাত্মানুগমনেন গাম্।
বিদ্যামভ্যসনেনেব প্রসাদয়িতুমর্হসি॥ (১।৮৮)

মহারাজ দিলীপ পুত্রলাভের জন্য এই আশ্রমধেনু নন্দিনীর পরিচর্যাব্রত গ্রহণ করিলেন। সেই হোমধেনু নন্দিনীকে অগ্রে রাখিয়া রক্ষকরূপে দিলীপ যখন তাহার পশ্চাৎ-অনুসরণ করিতেছিলেন, কবি তখনও রাজার রাজৈশ্বর্য বা মহত্ত্বকে ক্ষুণ্ণ হইতে দিলেন না। রাজা যেন গো-রূপধরা সসাগরা পৃথিবীরই রক্ষক হইয়া বনে বিচরণ করিতেছিলেন।

পয়োধরীভূত-চতুঃসমুদ্রাং
জুগোপ গোরূপধরামিবোর্বীম্॥ (২।৩)

চারিটি সমুদ্র আজ যেন নন্দিনীর পয়োধরের চারিটি বাঁট হইয়া শোভা পাইতেছে,—সেই পয়োধরীভূত-চতুঃসমুদ্রা গোরূপধরা পৃথিবীকেই যেন দিলীপ এই পার্বত্য অরণ্যে পালন করিতেছিলেন।

'রঘুবংশে'র দ্বিতীয় সর্গেই দেখিতে পাই, সন্ধ্যায় নন্দিনী বশিষ্ঠের আশ্রমে ফিরিতেছে। দিগ্‌দিগন্ত সঞ্চারপূত করিয়া দিনের অবশেষে পল্লবরাগতাম্রা সূর্যের প্রভা এবং মুনির ধেনু উভয়ই আপন আপন নিলয়ে ফিরিয়া চলিল,—পল্লবরাগতাম্রা সূর্যপ্রভা পশ্চিম নিলয়ে দিনের পরে ফিরিয়া আসিল, আর পল্লবরাগতাম্রা হোমধেনুটি ফিরিয়া আসিল মুনির আশ্রমে।

সঞ্চারপূতানি দিগন্তরাণি
কৃত্বা দিনান্তে নিলয়ায় গন্তুম্।
প্রচক্রমে পল্লবরাগতাম্রা
প্রভা পতঙ্গস্য মুনেশ্চ ধেনুঃ॥ (২।১৫)

সারাদিন বনে নন্দিনীকে চরাইয়া রাজা দিলীপ সন্ধ্যায় আশ্রমে ফিরিয়াছেন। রাণী সুদক্ষিণা ব্যাকুল আগ্রহে অগ্রবর্তিনী হইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া ধেনুর আগে আগে চলিল,—পশ্চাতে

মহারাজ দিলীপ,—মাঝখানে গাভী নন্দিনী। তখন সেই পাটলবর্ণা গাভী নন্দিনীকে মনে হইতেছিল, যেন দিন এবং রজনীর মধ্যবর্তিনী পাটলবর্ণা মূর্তিমতী সন্ধ্যা।

পুরস্কৃতা বর্ত্মনি পার্থিবেন
প্রত্যুদ্গতা পার্থিব-ধর্মপত্ন্যা।
তদন্তরে সা বিররাজ ধেনু-
র্দিনক্ষপামধ্যগতেব সন্ধ্যা॥ (২।২০)

উপমা দ্বারা উপমানের সংস্পর্শে উপমেয়কে মহিমান্বিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা আমরা লক্ষ্য করিতে পারি কালিদাসের বহু শ্লোকেই। অজ এবং ইন্দুমতীর বিবাহে তাহারা উভয়ে যখন যজ্ঞীয় হোমাগ্নি প্রদক্ষিণ করিতেছে তখন,—

প্রদক্ষিণপ্রক্রমণাৎ কৃশানো-
রুদর্চিষস্তন্মিথুনং চকাশে।
মেরোরুপান্তেষ্বিব বর্তমান-
মন্যোন্য-সংসক্তমহস্ত্রিযামম্॥ (৭।২৪)

প্রজ্বলিত অগ্নি প্রদক্ষিণের গতিতে সেই দম্পতি যেন মেরুর উপান্তে অন্যোন্য-সংসক্ত দিনযামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। দিন এবং রজনী যেন অঞ্চলে গ্রন্থি বাঁধিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছে,—মাঝখানে দাঁড়াইয়া যজ্ঞাগ্নিরূপ সুমেরু। সুমেরুকে যজ্ঞাগ্নি বলিবারও যথেষ্ট সার্থকতা রহিয়াছে। দিবা এবং রাত্রির মিলন হয় প্রভাতে এবং সন্ধ্যায়। উভয় সময়ই সূর্যের আরক্তিম কিরণ প্রতিফলিত হয় পর্বতগাত্রে, পর্বত-শিখর তখন যেন একটা অভ্রভেদী জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। সেই অগ্নিকুণ্ডই যেন দিনরজনীর মিলনক্ষণের সাক্ষীভূত হোমাগ্নি। ঠিক এই শ্লোকটিই আবার দেখিতে পাই 'কুমার-সম্ভবে' হরপার্বতীর যজ্ঞাগ্নি প্রদক্ষিণ কালে।

বহু স্থানে এই মহিমার ব্যঞ্জনা কালিদাস আনিতে পারিয়াছেন অতি অল্পায়াসে এবং অল্প কথায়; হিমালয়ের বর্ণনায় 'কুমারসম্ভবে' কবি মুনিগণের মুখে বলাইলেন,—'মনসঃ শিখরাণাঞ্চ সদৃশী তে সমুন্নতিঃ' (৬।৬৬)—একই সমান তোমার সমুন্নতি—মনেরও শিখরেরও। আবার মুনিগণ বলিয়াছেন,—'তোমার সরিৎসমূহ (গঙ্গাদি) এবং কীর্তিসমূহ—উভয়ই লোককে করে পূত',—'পুনন্তি লোকান্ পুণ্যত্বাৎ কীর্তয়ঃ সরিতশ্চ তে'। (৬।৬৯)

উপমা প্রয়োগের দ্বারা কালিদাস অনেক সময় এমনই চিত্ত-বিস্ফার-রূপ চমৎকৃতির সৃষ্টি করিতে পারিতেন যে শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্ন সেখানে একান্তভাবে অবান্তর হইয়া যায়। আমরা এ-জাতীয় অনেক উপমা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি (মেঘদূত, পূর্বমেঘ, ৪১,৬৩)। 'কুমার-সম্ভবে' কবি অকালবসন্তে শ্যাম বনস্থলীতে সহসা ফুটিয়া ওঠা কিংশুকের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

> বালেন্দুবক্রাণ্যবিকাশভাবা-
> দ্বভুঃ পলাশান্যতিলোহিতানি।
> সদ্যো বসন্তেন সমাগতানাং
> নখক্ষতানীব বনস্থলীনাম্॥ (৩।২৯)

পলাশগুলি এখনও সম্পূর্ণ ফুটিয়া ওঠে নাই—সেগুলি বালেন্দুবক্র এবং অতিরক্তবর্ণ; যেন বসন্ত-সঙ্গতা বনস্থলীর গায়ে সদ্যকৃত নখক্ষত!

'শৃঙ্গার-তিলকে'র * ভিতর দেখিতে পাই, একটি নারী সখীগণকে

---

* 'শৃঙ্গার-তিলক' প্রভৃতি কাব্যগুলি কালিদাসের রচিত নয় বলিয়াই পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত; এই উৎপ্রেক্ষাটি কালিদাসের উৎপ্রেক্ষার সমজাতীয় বলিয়া এখানে ইহার আলোচনা করা গেল।

বলিতেছে,—বহুদিন প্রবাসের পর প্রিয়তম ফিরিয়া আসিয়াছে,—প্রবাসের কাহিনী শুনিতে শুনিতেই কথায় কথায় অর্ধরাত্রি কাটিয়া যায়; তারপরে আমি যখন লীলা-কলহ-কোপের সূত্রপাত করি, ইহার মধ্যেই পূর্বদিক সতীনের মত লাল হইয়া ওঠে!

সপত্নীব প্রাচী দিগিয়মভবত্তাবদরুণা॥

প্রিয়মিলন-সুখ হইতে রক্তারুণ প্রভাত যে কিরূপে নারীকে বঞ্চিত করে তাহা ঐ একটিমাত্র উৎপ্রেক্ষায় স্পষ্টতমরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, প্রাচী সপত্নীর মত লাল হইয়া যায়।

কালিদাসের উপমায় পাশাপাশি অঙ্কিত চিত্র

কালিদাসের কতগুলি উপমার ক্ষেত্রে মনে হয়, কবি যেন পাশাপাশি দুইখানি ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন—দুইখানি ছবি একযোগে যেন আমাদের চিত্তের উপরে কাজ করিয়া একই ফল প্রসব করে। যেমন রঘুবংশে দেখি, রাজা দিলীপ কর্তৃক পরিচর্যমানা হোমধেনু নন্দিনীর উপরে সহসা যখন মায়াসিংহ আপতিত হইল তখন—

স পাটলায়াং গবি তস্থিবাংসং
ধনুর্ধরঃ কেশরিণং দদর্শ।
অধিত্যকায়ামিব ধাতুময্যাং
লোধ্রদ্রুমং সানুমতঃ প্রফুল্লম্॥ (২।২৯)

রাজা দেখিলেন পাটলবর্ণা গাভীটির উপরে আপতিত একটি কেশরী—যেন পর্বতের ধাতুময়ী অধিত্যকায় একটি প্রফুল্ল লোধ্রদ্রুম!

'রঘুবংশে' রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় বলা হইয়াছে,—

আপাদপদ্মপ্রণতাঃ কলমা ইব তে রঘুম্।
ফলৈঃ সংবর্ধয়ামাসুরুৎখাতপ্রতিরোপিতাঃ ॥ (৪।৩৭)

বঙ্গীয় রাজাগণকে রঘু প্রথমে উন্মুলিত করিলেন এবং পরে আবার স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন—তখন তাহারা রঘুর পাদপদ্মে সমধিক প্রণত হইল—যেমন ফলভারে মূলদেশ পর্যন্ত নত হইয়া শস্যদান করে ধানের চারাগুলি, যদি তাহাদিগকে ভূমি হইতে একবার তুলিয়া পুনরায় ভূমিতে রোপণ করিয়া দেওয়া হয়।

ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-সভায় যুবরাজ অজ প্রস্তর সোপান অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতেছিল—সোপান বাহিয়া যুবরাজ মঞ্চে আরোহণ করিতেছে—যেন শিলাপরম্পরায় পদক্ষেপ করিয়া সিংহশাবক পার্বত্য-শিখরে আরোহণ করিতেছে।—

বৈদর্ভনির্দিষ্টমসৌ কুমারঃ
ক্লৃপ্তেন সোপানপথেন মঞ্চম্।
শিলাবিভঙ্গৈর্মৃগরাজশাব-
স্তুঙ্গং নগোৎসঙ্গমিবারুরোহ ॥ (৬।৩)

'রঘুবংশে'র অন্যত্র দেখি, রাবণ কর্তৃক অত্যাচারিত দেবগণ বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিলে বিষ্ণুও রাবণ বিনাশের আশ্বাস দিয়া অন্তর্ধান হইলেন—যেমন অন্তর্ধান করে মেঘ অনাবৃষ্টিতে শুষ্ক শস্যকে অভিষেকের দ্বারা সরস করিয়া দিয়া। বিষ্ণুই মেঘ—রাবণ অনাবৃষ্টি—নিপীড়িত দেবগণ শুষ্ক শস্য।—

রাবণাবগ্রহক্লান্তমিতি বাগমৃতেন সঃ।
অভিবৃষ্য মরুৎশস্যং কৃষ্ণমেঘস্তিরোদধে ॥ (১০।৪৮)

'কুমার-সম্ভবে' দেখি, আগে আগে চলিয়াছেন কনকপ্রভা

মাতৃকাগণ—তাঁহাদের পশ্চাতে চলিয়াছেন সিতকপালাভরণা কালী—যেন আগে চমকাইতেছে স্বর্ণাভ বিদ্যুৎ—পিছনে নীলমেঘরাজি—তাহার বুকে শ্বেতবলাকাপংক্তি।

তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনকপ্রভাণাং
কালী কপালাভরণা চকাশে।
বলাকিনী নীলপয়োদরাজী
দূরং পুরঃক্ষিপ্তশতহ্রদেব ॥ (৭।৩৯) *

'রঘুবংশে' দেখি, পরশুরামের কোপ হইতে মুক্ত রামকে অবলম্বন করিয়া রাজা দশরথের পরিতোষলাভ—যেন দাবানল অতিক্রান্ত বৃক্ষের উপরে শীতল বৃষ্টিপাত।

তস্যাভবৎ ক্ষণশুচঃ পরিতোষলাভঃ
কক্ষাগ্নিলঙ্ঘিততরোরিব বৃষ্টিপাতঃ ॥ (১১।৯২)

আবার দেখি, সকল বিষয়-স্নেহ ভোগের পর 'দশান্ত'-প্রাপ্ত রাজা দশরথ—যেন ঊষার সমস্ত স্নেহ বা তৈলভুক্ত হইবার পরে আসন্ননির্বাণ প্রদীপের শিখা!

নির্বিষ্টবিষয়স্নেহঃ সঃ দশান্তমুপেয়িবান্।
আসীদাসন্ননির্বাণঃ প্রদীপার্চিরিবোষসি ॥ (১২।১)

এ-জাতীয় উপমার সর্বত্রই লক্ষ্য করিতে পারি একেবারে সমজাতীয় দুইটি ছবি যেন পাশাপাশি সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে—উপমানের ছবিটি সর্বত্রই উপমেয় ছবিটির সর্বাঙ্গীণ পরিপোষক।

---

* তুলনীয়—তাড়কা চলকপালকুণ্ডলা
কালিকেব নিবিড়া বলাকিনী॥ রঘুবংশ (১১।১৫)

কালিদাসের উপমায় চেতন-অচেতনের অদ্বয়ত্ব

উপমা প্রভৃতি অর্থালঙ্কারের ভিতরে একটি প্রধান জিনিস অচেতন জড় প্রকৃতিকে চেতনের অনুরূপ করিয়া ভাবা। ইহাকে আমরা বলিতে পারি জীববদ্-ব্যবহার বা personification। সংস্কৃতের 'সমাসোক্তি' অলঙ্কারের পশ্চাতে রহিয়াছে জড়-প্রকৃতিকে এইরূপ জীববদ্-ব্যবহার। সাহিত্য প্রধানতঃ মানুষের জীবনকে অবলম্বন করিয়া, বহির্জগতের ভিতরে এই জীবনের সাধর্ম্য খুঁজিয়া পাইতে হইলে বহিঃপ্রকৃতির প্রবাহকে আমাদের জীবনের এই প্রবাহ হইতে অভিন্ন করিয়া দেখিতে হয়। জীববদ্-ব্যবহারের পশ্চাতেও রহিয়াছে এই জীবনধারা ও সৃষ্টিপ্রবাহ-ধারার ভিতরে একটা প্রচ্ছন্ন ঐক্যবোধ। মানুষের চেতনধর্মের ভিতরে এইভাবে বহিঃপ্রকৃতিকে মানুষের মতন করিয়া দেখিবার একটা প্রচ্ছন্ন বাসনা চিরকালই রহিয়াছে। এই বাসনাকে আমরা নাম দিতে পারি মানুষী-করণ বা নরত্বারোপ (Anthropomorphism)। বহিঃপ্রকৃতিকে এইভাবে মানুষের দৈহিকরূপ ও তাহার আন্তর পুরুষের সমান করিয়া দেখিবার ভিতরে আছে বহিঃপ্রকৃতির ভিতর দিয়া একটা গভীর আত্মোপলব্ধির আনন্দ,—সেই আনন্দকেই আমরা রূপান্তরিত ভাবে দেখিতে পাই কাব্যের এই জীববদ্-ব্যবহারের ভিতরে। মূক, বধির, অচেতন প্রকৃতিকে আমরা আমাদের চেতনার ভিতরে নিরন্তর জ্ঞাতে অজ্ঞাতে যে প্রাণধর্মে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতেছি, তাহাকে অতি স্পষ্ট করিয়া পাই কাব্যের এই অর্থালঙ্কারের ভিতরে। এখানে কাব্যে যে আমরা শুধু ভাব-সম্বেগের সম্যক্ প্রকাশ দেখিয়াই আনন্দিত হই তাহা নহে, ইহার ভিতরে আমাদের থাকে আরও একটা পাওনা,—সে এই জীববদ্-ব্যবহারের আনন্দ,—বিশ্ব-প্রকৃতির ভিতর দিয়া আত্মোপলব্ধির একটা

নিগূঢ় আনন্দ। জড় ও চেতনের ভিতরে একই রূপ এবং একই জীবনধারা আবিষ্কার করিয়া আমরা মনের অজ্ঞাতে লাভ করি একটা পরম আত্ম-তৃপ্তি।

কাব্যের মধ্যে এই যে জীববদ্-ব্যবহারের ভিতরে আত্মোপলব্ধির আনন্দ ইহা কাব্যানন্দ হইতে ভিন্ন জাতীয় নহে ; কাব্যানন্দের সহিত রহিয়াছে ইহার নিবিড় যোগ ; তাই সে কাব্যানন্দ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে আমাদিগকে তৃপ্ত করে না। কাব্যানন্দের ভিতরেই সর্বদা থাকে একটা আত্মোপলব্ধির আনন্দ,—বিশ্বসৃষ্টির সকল সৌন্দর্য-মাধুর্য,—সকল ক্ষুদ্রত্ব, বিরাটত্ব,—সকল হাসিকান্নার ভিতর দিয়া নিজের আন্তর সত্তাকেই প্রতিনিয়ত সাহিত্যের ভিতরে আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করি। আমার মনে হয়, সাহিত্যে জীববদ্-ব্যবহারের ভিতরে যে আত্মানুভূতির আনন্দ, তাহা কাব্যের এই মূল আত্মানুভূতির আনন্দকেই আরও বাড়াইয়া দেয়, এইখানেই কাব্যে জীববদ্-ব্যবহারের সার্থকতা।

একেবারে প্রাচীন যুগের সাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই, এই জীববদ্-ব্যবহার রূপ লইয়াছিল অসংখ্য দেবদেবী, পৈরী, জলকন্যা প্রভৃতির ভিতরে। বনদেবী, জলকন্যা, পৈরী, প্রভৃতির আবির্ভাবে জগতের মধ্যযুগের সাহিত্যও ভরিয়া রহিয়াছে। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, ততই সাহিত্যের ভিতরে এই জীববদ্-ব্যবহার একটা সূক্ষ্ম গভীর রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল। আমরা বহিঃপ্রকৃতির ভিতরে দেবদেবীর আবিষ্কার না করিয়া বহিঃপ্রকৃতিকেই চেতন ধর্মে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতে লাগিলাম।

এই জীববদ্-ব্যবহারের মধ্যেও কালিদাসের একটা স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। কালিদাসের চোখের সম্মুখে বহিঃপ্রকৃতি যেন সর্বদাই

একান্ত সজীব এবং সচেতন। কালিদাসের বহিঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে এই ভাবদৃষ্টি ইউরোপীয় কোনও প্রকৃতি-কবির অনুরূপ নহে। কালিদাস কখনও বহিঃপ্রকৃতির ভিতরে কোন অশরীরী আত্মার আবিষ্কার বা সন্ধান করেন নাই,—বহিঃপ্রকৃতি তাঁহার কাছে একান্ত সজীব হইয়া উঠিয়াছে তাহার সকল জৈব প্রাণধর্মে,—তাহার সকল চেতনা-বিলাসে। ইহার ভিতরে কোন দার্শনিকতা নাই,—রহিয়াছে স্পষ্ট এবং দৃঢ় একটা বিশ্বাস, বাস্তব অনুভূতি। 'মেঘদূত' কাব্যের ভিতরে ধূম-জ্যোতিঃ-সলিল-মরুতের সন্নিপাতে ঘটিত অচেতন মেঘই যে শুধু দৌত্যের কার্য গ্রহণ করিয়াছে তাহা নহে,—সমগ্র কাব্যখানির ভিতরেই দেখিতে পাওয়া যায়,—সমগ্র বহিঃপ্রকৃতি বিরহী যক্ষ এবং তাহার বিরহিণী প্রিয়তমার সকল বেদনা, সকল মাধুর্য, কারুণ্য এবং বৈচিত্র্যকেই যেন বণ্টন করিয়া লইয়াছে; বল্কলাবৃতা 'সরোসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেন', 'অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনম্', 'অধরঃ কিশলয়রাগঃ কোমলবিট-পানুকারিণৌ বাহূ' শকুন্তলাও তপোবন দুহিতা; নগাধিরাজ হিমালয়-দুহিতা 'পর্যাপ্তপুষ্প-স্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' উমাও প্রকৃতিদুহিতা; সীতাকে ত কবিগুরু বাল্মীকিই প্রকৃতি-দুহিতা করিয়া রাখিয়াছেন।

কালিদাসের কাব্যে অনেক স্থানে বহিঃপ্রকৃতি মানুষের সহিত সমানভাবে কাব্যের নায়ক-নায়িকার অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে অনসূয়া প্রিয়ংবদা যেমন, দুষ্যন্ত যেমন, তপোবন প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। এই মূক প্রকৃতিকে কোন নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান, এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে তাহা বোধকরি সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই। প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া,

তাহার মুখে কথাবার্তা বসাইয়া রূপকনাট্য রচিত হইতে পারে—কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃতি রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহা দ্বারা নাটকের এত কার্য-সাধন করাইয়া লওয়া, এ ত অন্যত্র দেখি নাই।" শকুন্তলা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলিয়াছেন, 'মেঘদূত', 'কুমার-সম্ভব' প্রভৃতি কাব্য সম্বন্ধেও প্রায় সেই একই কথা বলা যাইতে পারে।

এইরূপে কালিদাসের সকল কাব্যের ভিতরেই বহিঃপ্রকৃতি ও মানুষের ভিতরে একটা গভীর একাত্মবোধ রহিয়াছে। বহিঃপ্রকৃতিকে বর্ণনা করিতে হইলেই কবি তাই তাহাকে প্রাণ-ধর্মে চেতন-ধর্মে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। 'কুমার-সম্ভবে' যোগ-নিমগ্ন মহাদেবের তপোবনে যখন অকাল বসন্তের আগমন হইল তখন,—

> পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ
> স্ফুরৎ-প্রবালোষ্ঠমনোহরাভ্যঃ।
> লতাবধূভ্যস্তরবোঽপ্যবাপু-
> র্বিনম্রশাখা-ভুজবন্ধনানি॥ (৩।৩৯)

লতাবধূগণ আপন যৌবনের লাবণ্য-প্রাচুর্যেই যেন তরুগণের বিনম্র শাখাবাহুর বন্ধনলাভ করিয়াছিল। প্রচুর পুষ্পস্তবকে তাহাদের স্তনভার,—অচিরোদ্‌গত কিশলয়ে তাহাদের মনোহর ওষ্ঠের লাবণ্য, এই সৌন্দর্যের প্রাচুর্যের ভিতর দিয়াই যেন তাহারা প্রিয়তমের নিকট হইয়া উঠিয়াছিল সৌভাগ্যবতী। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, 'পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' উমার সহিত এই সকল ব্রততী বধূদিগের একটা নিগূঢ় সাজাত্য রহিয়াছে।

রঘুবংশের ভিতরেও দেখিতে পাই, রাজকুমার অজ এবং রাজকুমারী ইন্দুমতী যখন মিলিত হইল তখন,—

হস্তেন হস্তং পরিগৃহ্য বধ্বাঃ
স রাজসূনুঃ সুতরাং চকাশে।
অনন্তরাশোকলতা-প্রবালং
প্রাপ্যেব চূতঃ প্রতিপল্লবেন ॥ (৭।২১)

সন্নিহিত অশোকলতার নবপল্লবকে প্রতিপল্লবের দ্বারা বিজড়িত করিয়া সহকার তরু যেমন শোভা প্রাপ্ত হয়, নবপরিণীতা বধূর হস্তে হস্ত স্থাপন করিয়া রাজকুমার অজও তেমনি শোভা পাইতে লাগিল। উৎপ্রেক্ষাটির পশ্চাতেও রহিয়াছে বৃক্ষলতাদি সম্বন্ধে একটি মধুর জীববদ্‌-ব্যবহার।

কালিদাস তরুলতার ভিতরে যে জীববদ্‌-ব্যবহার দেখাইয়াছেন তাহা শুধু একটা কবি-প্রসিদ্ধি মাত্র নহে, তাহার ভিতরে একটা স্বতন্ত্র চারুতা রহিয়াছে। মূক-বধির প্রকৃতির ভিতরে কবি যে শুধু চিরাচরিত আলঙ্কারিক মতে প্রাণ-ধর্ম আরোপ করিয়াছেন তাহা নহে,—তাহার ভিতরে কবি আবিষ্কার করিয়াছিলেন মানব জীবনের সকল সূক্ষ্ম মাধুর্য—সকল গভীর রহস্য। তাই প্রস্তাবিত বিষয়ে অপ্রস্তাবিতের ব্যবহার আরোপের ভিতরেও রহিয়াছে কালিদাসের কবি-প্রতিভার সূক্ষ্ম নৈপুণ্য। এই জীববদ্‌-ব্যবহার এবং প্রস্তাবিত বিষয়ে অপ্রস্তাবিতের আরোপের সূক্ষ্ম নৈপুণ্যে কাব্যের বিষয়টিই যে শুধু সরস হইয়া ওঠে তাহা নহে, সেখানে বিষয়-বস্তুর সরসতার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ-ভঙ্গিটিও একটি অপূর্ব চারুতা লাভ করে,—প্রকাশ-ভঙ্গির সেই অপূর্ব চারুতায়ই অলঙ্কারের সার্থকতা। শকুন্তলা-নাটকে দেখিতে পাই, জল-সেচনরতা শকুন্তলা সখীদিগকে বলিতেছে,—'এসো

বাদেরিদপল্লবঙ্গুলীহিং তুবরাবেই বিঅ মং কেসররুক্খও, জাব ণং সম্ভাবেমি,'—অর্থাৎ বাতাসে চঞ্চল পল্লবরূপ অঙ্গুলি দ্বারা ক্ষুদ্র বকুল বৃক্ষ যেন আমাকে ইসারায় ডাকিতেছে,—উহার অনুরোধ রক্ষা কবি।' এই বলিয়া শকুন্তলা বকুল গাছের নিকটে অগ্রসর হইল। প্রিয়ংবদা বলিল, 'হলা সউন্দলে এত্থ এব্ব দাব মুহুত্তঅং চিট্‌ঠ জাব তুএ উবগদাএ লদাসণাহো বিঅ অঅং কেসররুক্খও পড়িভাই।' — হলা শকুন্তলে এইখানেই মুহূর্তের জন্য দাঁড়াও,—যাহাতে তুমি কাছে যাওয়ায় ঐ বকুল গাছটি 'লতা-সনাথে'র মত শোভা পায়।'

অনসূয়া আবার শকুন্তলাকে ডাকিয়া বলিতেছে,—'হলা শকুন্তলে, এই সেই সহকারের স্বয়ংবর-বধূ নবমালিকা—যাহাকে তুমি নাম দিয়াছ বন-জ্যোৎস্না ;—ইহাকে কি বিস্মৃত হইয়াছ ? শকুন্তলা বলিল,—'তখন তবে নিজেকেও বিস্মৃত হইয়া যাইব'। এই বলিয়া বন-জ্যোৎস্নার সমীপবর্তী হইল এবং তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—'হলা রমণীএ ক্‌খু কালে ইমস্‌স লদাপাঅবমিহুণস্‌স বইঅরো সংবুত্তো। ণবকুসুমজোব্বণা বণজোসিণী বদ্ধপল্লবদাএ উবহোঅক্‌খমো সহআরো'। 'হলা এই রমণীয় কালে এই লতাপাদপ-মিথুনের সমাগম কাল উপস্থিত। নবকুসুম-যৌবনা এই বন-জ্যোৎস্না,—আর বহু পল্লব হেতু সহকার তরুও উপভোগক্ষম।' এই বলিয়া শকুন্তলা লতা-পাদপ-মিথুনের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শকুন্তলাকে এ অবস্থায় দেখিয়া ঈষৎ মুখরা প্রিয়ংবদা বলিতেছে,—'অনসূয়ে শকুন্তলা কেন বন-জ্যোৎস্নার পানে অতিমাত্র তাকাইয়া আছে জান ?' অনসূয়া বলিল, —'আমি কিছু ভাবি নাই, কেন বলত ?' প্রিয়ংবদা উত্তর করিল,— 'জহ বণজোসিণী অনুরূবেণ পাঅবেণ সংগদা অবি ণাম এব্বং অহং বি অত্তণো অণুরূবং বরং লহেঅং ত্তি।'—বন-জ্যোৎস্না যেমন অনুরূপ

পাদপের সহিত সঙ্গত হইয়াছে, আমিও কি এইভাবে নিজের অনুরূপ বরলাভ করিতে পারিব ?—এই ভাবিয়া।'

ঈষৎ চপল এই কুমারী তাপসকন্যা তিনটির সকল কথোপকথনের ভিতর দিয়া স্পষ্ট বোঝা যায় বন-জ্যোৎস্না এবং সহকার তরু এখানে আর মূক প্রকৃতির অংশমাত্র নহে,—তাহাদের সহিত রহিয়াছে যৌবনের প্রচ্ছন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা বুকে লইয়া জাগিয়া ওঠা একটি নবীন দম্পতীর অভেদ সিদ্ধান্ত; কুমারী-জীবনের সেই স্বপ্ন, সেই অভেদ-সিদ্ধান্তকে পশ্চাতে রাখিয়াই সমস্ত দৃশ্যটি এমন সজীব এবং সরস হইয়া উঠিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতির সহিত যে মানুষের যোগ উহা পরম আত্মীয়তা-বোধ। প্রকৃতি যে তাহার কোনও একটা গভীর রহস্যময়ী আধ্যাত্মিকতার রূপে আমাদের কাছে উপস্থিত তাহা নহে,—সে আমাদের নিকট আসে তাহার রক্তমাংসের রূপ লইয়া। সেই রক্তমাংসের বাস্তব রূপের সহিত যেন আমাদের রহিয়াছে প্রত্যক্ষ নাড়ীর যোগ। বিশেষ করিয়া সজীব তরুলতা এবং সেই তরুলতা-বেষ্টিত তপোবন বা বনস্থলী কালিদাসের নিকট সর্বদাই একান্ত সচেতন। কালিদাসের কাব্যে মানুষ সর্বদা ইহাদের সুখে দুঃখে সুখী এবং দুঃখী, আবার মানুষের সুখ-দুঃখেও ইহারা সম-ব্যথী।

প্রকৃতি বিষয়ে জীববদ্-ব্যবহার এবং প্রস্তাবিত বিষয়ে অপ্রস্তাবিতের ব্যবহার আরোপ যে কত মধুর ভাবে কাব্যের মাধুর্যের সহিত মিলাইয়া দেওয়া যায়, তাহা আমরা দেখিতে পাই এই চতুর্থ অঙ্কেরই একটি ঘটনার ভিতরে। শকুন্তলার আশ্রম হইতে বিদায়ের পূর্বক্ষণে দুইটি ঋষি বালক নানাবিধ প্রসাধন-আভরণ হস্তে করিয়া প্রবেশ করিল। গৌতমী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বৎস হারীত, এ সকল কোথায়

পাইলে ?' প্রথম বালক উত্তর করিল,—'তাত কণ্বের প্রভাবে'। গৌতমী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ইহা কি তবে মানসী সিদ্ধি ?'—অর্থাৎ মহর্ষি কণ্ব কি তপঃপ্রভাবে এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন ?' দ্বিতীয় বালক উত্তর করিল,—'না তাহা নয়—শুনুন, আপনারা আমাদিগকে আজ্ঞা করিলেন—শকুন্তলার জন্য বনস্পতিদের নিকট হইতে কুসুম আহরণ করিয়া আনিতে,—আমরাও গিয়া দেখি—

> ক্ষৌমং কেনচিদিন্দুপাণ্ডু তরুণা মাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতং
> নিষ্ঠ্যূতশ্চরণোপরাগসুভগো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ।
> অন্যেভ্যো বন-দেবতা-কর-তলৈরাপর্বভাগোত্থিতৈ-
> র্দত্তান্যাভরণানি তৎকিশলয়োদ্ভেদ-প্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ॥

কোন বৃক্ষ চন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ মঙ্গল কার্যের উপযোগী ক্ষৌম বস্ত্র প্রদান করিয়াছে,—কোন বৃক্ষ চরণের উপরঞ্জনযোগ্য তরল অলক্তক রস ক্ষরণ করিয়াছে,—অন্যান্য তরুগণের ভিতর দিয়াও বনের দেবতাগণ তাহাদের আরক্তিম নবকিশলয়-করতল দ্বারা একে যেন অপরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বহু আভরণ দান করিয়াছে। সম্মিলিত তপোবন-তরুগণের নব পল্লবের আরক্তিম কোমল হস্ত দ্বারা বন-দেবতাগণই যেন পতিগৃহগামিনী শকুন্তলাকে মঙ্গল উপহার পাঠাইয়াছেন। আশ্রমের তরুলতাগণের শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাক্ষণে এই মঙ্গল উপহার পাঠাইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে,—সে কারণ শকুন্তলার সহিত এই সকল তরুলতার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ—নাড়ীর যোগ। তাই শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে তাত কণ্ব বলিলেন,—

> পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
> নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।

আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতি-সময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্ ॥

'হে সন্নিহিত তরুগণ,—তোমাদের জলপান করিবার পূর্বে যে নিজে কখনও জলপান করিত না, অর্থাৎ তোমাদের জল সেচন করিবার পূর্বে যে জলপান করিত না,—ভূষণপ্রিয়া হইয়াও স্নেহবশতঃ যে কখনো তোমাদের পল্লব ছিঁড়িয়া গ্রহণ করিত না, তোমাদের কুসুম-প্রসবের সময়ে যাহার মনে আনন্দের উৎসব জাগিত,—সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছে, তোমরা সকলে তাহাকে গমনের আদেশ দাও।' মহর্ষির এ-বাক্যে তপোবন কোকিল-কণ্ঠের দ্বারা সাড়া দিয়াছিল।

শকুন্তলা প্রিয়ংবদাকে বলিয়াছিল,—সখি প্রিয়ংবদে, আর্যপুত্রকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেও আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার চরণ উঠিতেছে না। প্রিয়ংবদা উত্তর করিল, সখি তুমিই যে শুধু তপোবন বিরহে কাতর তাহা নহে, তোমার বিরহে তপোবনেরও সেই একই অবস্থা।

উগ্‌গলিঅ-দব্‌ভ-কঅলা মআ পরিচ্চত্ত-ণচ্চণা মোরা।
ওসরিঅ-পণ্ডুপত্তা মুঅন্তি অস্‌সু বিঅ লদাও ॥

মৃগগুলির মুখ হইতে কুশের গ্রাস স্খলিয়া পড়িতেছে, ময়ূরগুলি নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে, আর লতা সমূহ হইতে পাণ্ডুপত্রগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহারাও যেন বিরহে অশ্রু বিসর্জন করিতেছে।

ইহার পর শকুন্তলা বনতোষিণী লতাটিকে স্মরণ করিয়া তাহার নিকটে গিয়া বলিল,—'বণজোসিণি চূদসংগদা বি মং পচ্চালিঙ্গ ইদো গদাহিং সাহাবাহাহিং। অজ্জপ্‌পহুই দূরপরিবট্টিণী দে ভবিস্‌সম্।' 'হে বনতোষিণী, আজ তুমি চূত-সঙ্গতা হইলেও শাখা বাহু এই দিকে

প্রসারিত করিয়া একবার আমাকে প্রত্যালিঙ্গন কর,—আজ হইতে আমি তোমার নিকট হইতে দূরবর্তিনী হইলাম।'

মহর্ষি কণ্ব বলিলেন,—

সংকল্পিতং প্রথমমেব ময়া তবার্থে
ভর্তারমাত্মসদৃশং সুকৃতৈর্গতা ত্বম্।
চূতেন সংশ্রিতবতী নবমালিকেয়ম্
অস্যামহং ত্বয়ি চ সম্প্রতি বীত-চিন্তঃ॥

'শকুন্তলে, আমি প্রথমেই তোমার জন্য যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, সুকৃতিবশে ঠিক সেইরূপেই তুমি আত্ম-সদৃশ স্বামী লাভ করিয়াছ। আর এই নবমালিকা লতা সম্বন্ধেও আমার সঙ্কল্প-অনুরূপ আম্রতরুরই আশ্রয় সে লাভ করিয়াছে; সম্প্রতি তোমার বিষয়ে এবং এই বনতোষিণীর বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।' তাহা হইলে দেখিতেছি, বনতোষিণীর সহিত শকুন্তলারই যে শুধু সহোদরা ভাব তাহা নহে, তাত কণ্বেরও বনতোষিণী এবং শকুন্তলা এই দুইটি উদ্যানলতার প্রতি রহিয়াছে সমান পিতৃস্নেহ,—উভয়ই কুমারী কন্যা,—উভয়কেই অনুরূপ স্বামীর হস্তে দান করিয়া কন্যাদায় মুক্ত পিতা আজ নিশ্চিন্ত।

কথাগুলিকে আমি একটু বিষদভাবে আলোচনা করিতেছি এই জন্য, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জীবনের সম্বন্ধকে কালিদাস কত সহজ করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে জিনিসটি ভাল করিয়া না বুঝিলে কালিদাসের অলঙ্কার প্রয়োগের একটি মূল রহস্যই আমাদের কাছে ধরা পড়িবে না।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতি সম্বন্ধে এই যে জীববদ্-ব্যবহার এবং মানুষের সহিত এই যে তাহার আন্তরিক যোগ, তাহা শুধু কালিদাসের কাব্যের বিষয়-বস্তুকেই মহিমা দান করে

নাই, সে মধুরতর করিয়া তুলিয়াছে কাব্যের প্রকাশ-ভঙ্গিকে চিত্রের পরে চিত্র দ্বারা ; মানুষের জীবনের একটি সুকুমার অধ্যায়কে কথার তুলিতে কাব্যে আঁকিয়া তুলিতে তিনি বিশ্ব-প্রকৃতিকে শুধু পটভূমিরূপে গ্রহণ করেন নাই,—প্রকৃতির প্রবাহকে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার চিত্রগুলিতে জীবনের সমপর্যায়ে ফেলিয়া।

শুধু শকুন্তলা নাটকেই যে প্রকৃতির সহিত মানুষের এই আন্তরিক যোগের আমরা সন্ধান পাই তাহা নহে,—প্রকৃতির সহিত মানুষের এই নাড়ীর যোগ, ভাবের এই আদান-প্রদান রহিয়াছে কালিদাসের কাব্যে প্রায় সর্বত্র। 'রঘুবংশে'র দ্বিতীয় সর্গে দেখিতে পাই, রাজা দিলীপ মুনির ধেনুর পরিচর্যার জন্য সমস্ত পার্শ্বানুচর ত্যাগ করিয়া বনে বিচরণ করিতেছেন। কিন্তু কবি বলিতেছেন, সেই বনস্থলী মহারাজ দিলীপকে পার্শ্বচরবিহীনভাবে বিচরণ করিতে দিল না,—

> বিসৃষ্টপার্শ্বানুচরস্য তস্য
> পার্শ্বদ্রুমাঃ পাশভৃতা সমস্য।
> উদীরয়ামাসুরিবোন্মদানাম্
> আলোকশব্দং বয়সাং বিরাবৈঃ॥ (২।৯)

বরুণ-সদৃশ মহারাজ দিলীপ সমস্ত পার্শ্বানুচর ত্যাগ করিলেও বনের তরুরাজিই তাঁহার পার্শ্বচর হইয়াছিল ; উন্মদ বিহঙ্গ-কাকলীতে তাহারা সকলে মিলিয়া মহারাজ দিলীপের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

শুধু যে তরুগণই শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া পার্শ্বচরের ন্যায় জয়ধ্বনি করিতেছিল তাহা নহে,—

> মরুৎ-প্রযুক্তাশ্চ মরুৎসখাভং
> তমর্চ্যমারাদভিবর্তমানম্।

অবাকিরন্ বাললতাঃ প্রসূনৈ-
রাচারলাজৈরিব পৌর-কন্যাঃ ॥ (২।১০)

অগ্নির প্রতিমূর্তি রাজা দিলীপের মস্তকে সেই বনস্থলীতেও পৌরকন্যা-গণের লাজ-বর্ষণ হইয়াছিল,—সমীরণে ঈষৎ আন্দোলিত বাললতাগুলি পৌরকন্যাগণের ন্যায় তাঁহার মস্তকে শুভ্র প্রসূনের লাজাঞ্জলি দিতেছিল। রাজা এখানে 'মরুৎ-সখাভ'—যেন অগ্নির প্রতিমূর্তি ; আর অগ্নিসদৃশ রাজার আগমনে বাতাস আসিয়া আপনি মিলিয়াছিল, সে বাতাস যেন রাজদর্শনে একটা আনন্দের বন্ধনহীন প্রবাহ মাত্র,—বাললতারূপ পৌরকন্যাদের হাত হইতে সে ছড়াইয়া দিল শুভ্র ফুলের লাজাঞ্জলি।

আনন্দের দিনেই যে প্রকৃতির এই অভ্যর্থনা তাহা নহে,—মানুষের দুঃখেও তাহার রহিয়াছে গভীর সমবেদনা। ইন্দুমতীর বিরহে রাজা অজ যেদিন করুণ বিলাপধ্বনি তুলিয়াছিল সেদিনও,—

বিলপন্নিতি কোসলাধিপঃ
করুণার্থগ্রথিতং প্রিয়াং প্রতি।
অকরোৎ পৃথিবীরুহানপি
স্রুতশাখারস-বাষ্প-দূষিতান্ ॥ (৮।৭০)

প্রিয়ার জন্য কোসলাধিপ অজ যখন করুণ বাক্যে বহু বিলাপ করিলেন, সেই বিলাপের দ্বারা তিনি পৃথিবীর তরুরাজিকেও অশ্রুবাষ্পে ভরিয়া দিয়াছিলেন ; শাখারস স্রুত হইয়াই যেন তরুগণকে বাষ্প-দূষিত করিয়া দিতেছিল।

রামচন্দ্রও সীতাকে লইয়া বিমান-যোগে লঙ্কা হইতে ফিরিবার পথে সীতাকে বলিতেছিলেন,—

এতদ্গিরের্মাল্যবতঃ পুরস্তাদ্
আবির্ভবত্যম্বরলেখি শৃঙ্গম্।

নবং পয়ো যত্র ঘনৈর্ময়া চ
ত্বদ্‌বিপ্রযোগাশ্রু সমং বিসৃষ্টম্‌॥ (১৩।২৬)

ঐ দেখ সম্মুখে মাল্যবান পর্বতের অভ্রভেদী শৃঙ্গগুলি চোখের নিকটে আসিতেছে; এখানে তোমার বিয়োগে আমি অনেক অশ্রু পাত করিয়াছি। জলভরা নবীন মেঘও এখানে আমার সঙ্গে অনেক অশ্রু বিসর্জন করিয়াছে: মাল্যবানের শিখরে আমি আর মেঘ তোমার বিরহে সমান ভাবেই অশ্রু-বিসর্জন করিয়াছি; 'ত্বদ্‌বিপ্রযোগাশ্রু সমং বিসৃষ্টম্‌'।

লক্ষ্মণ যেদিন সীতাকে জাহ্নবী পুলিনে লইয়া আসিয়া তাহাকে রামের নির্বাসন বাণী শুনাইয়াছিল, সেদিন ধরণী-দুহিতা সীতা বাতাহতা বল্লরীর ন্যায় ধরিত্রী-মায়ের কোলেই লুটাইয়া পড়িয়াছিল।

ততোঽভিষঙ্গানিলবিপ্রবিদ্ধা
প্রভ্রশ্যমানাভরণপ্রসূনা।
স্বমূর্তিলাভ-প্রকৃতিং ধরিত্রীং
লতেব সীতা সহসা জগাম॥ (১৪।৫৪)

সেই বিপদের বাতাসে আহত সীতা তাহার রত্নালঙ্কাররূপ কুসুমগুলি ছড়াইয়া দিয়া লতার ন্যায় আপন জননী ধরিত্রীর কোলে আপনার দেহভার লুটাইয়া দিল। কারুণ্যকে কবি আরও কত করুণ করিয়া তুলিতে পারেন! মাতা ধরিত্রী যে বিপদের ঘায়ে লুটিয়া-পড়া অসহায়া কন্যার এই তীব্র বেদনায় আকুল হইয়া ওঠেন নাই তাহা নহে। সীতা মুহূর্তের জন্য ধৈর্য ধরিয়া লক্ষ্মণকে অনেক কথা বলিয়াছিল, কিন্তু লক্ষ্মণ ধীরে ধীরে চক্ষের অন্তরাল হইতেই বাণবিদ্ধা কুররীর ন্যায় সীতা মুক্ত কণ্ঠে কাঁদিয়া পড়িল। তখন করুণ বিলাপিনী

সীতার সেই বুকভাঙা ক্রন্দনে সমগ্র বনস্থলীও যেন সহসা কাঁদিয়া উঠিল।

নৃত্যং ময়ূরাঃ কুসুমানি বৃক্ষা
দর্ভানুপাত্তান্ বিজহুর্হরিণ্যঃ।
তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুঃখভাবম্
অত্যন্তমাসীদ্রুদিতং বনেঽপি॥ (১৪।৬৯)

ময়ূরগণ নৃত্য পরিত্যাগ করিল,—বৃক্ষগণ ঝর্ ঝর্ করিয়া কুসুমাশ্রু বর্ষণ করিল,—হরিণের মুখ হইতে অর্ধ-কবলিত কুশগুচ্ছ স্খলিয়া পড়িল। সমগ্র বনস্থলীই যেন সমবেদনায় সীতার ন্যায়ই আকুল অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল।

'মেঘদূতে' বিরহী যক্ষও বলিতেছে,—

মামাকাশপ্রণিহিতভুজং নির্দয়াশ্লেষহেতোঃ
লব্ধায়াস্তে কথমপি ময়া স্বপ্নসন্দর্শনেষু।
পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশো ন স্থলীদেবতানাং
মুক্তাস্থূলাস্তরুকিশলয়েষ্বশ্রুলেশাঃ পতন্তি॥ (উ। ৪৫)

হে প্রিয়তমে, স্বপ্নে আমি অতিকষ্টে তোমাকে লাভ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গনের জন্য যখন শূন্যে বাহুযুগল প্রসারিত করি, তাহা দেখিয়া যে বন-দেবতাগণ প্রচুর অশ্রু বর্ষণ করে না তাহা নহে,—তাই তরু-কিশলয়সমূহে তাহাদের স্থূল মুক্তার অশ্রু বেদনায় ঝরিয়া পড়ে।

'কুমার-সম্ভবে' দেখিতে পাই,—প্রবল ঝঞ্ঝাময়ী বৃষ্টির ভিতরেও অনাবৃত স্থানে শিলাতলশায়িনী উমাকে যেন তাহার এই মহাতপস্যার সাক্ষীভূতা রজনীগুলি বিদ্যুতের নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিতে লাগিল।

শিলাশয়াং তামনিকেতবাসিনীং
নিরন্তরাস্বন্তরবাতবৃষ্টিষু।

ব্যালোকয়ন্নু্ন্মিষিতৈ স্তড়িন্ময়ৈ-
র্মহাতপঃ সাক্ষ্য ইব স্থিতাঃ ক্ষপাঃ ॥ (৫।২৫)

ইহা শুধু বর্ণনা নহে,—প্রত্যেকটি কথার ভিতর দিয়া যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে মানুষের সহিত বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরতম যোগ। উমা তাহার কোমল অঙ্গে পার্বত্য বিজনে নৈশ অন্ধকারের ভিতরে যে কি কঠোর তপস্যা করিতেছে, তাহা দেখিবার আর কেহই ছিল না; সেই মহাতপস্যার সাক্ষী হইয়া রহিল সেই ঝঞ্ঝাময়ী মহানিশাগুলি তাহাদের বিদ্যুতের চাহনির ভিতর দিয়া।

কালিদাস বহিঃপ্রকৃতি ও মানুষের ভিতরে গভীর আত্মীয়তাবোধ লইয়া যত উপমার ছবি আঁকিয়াছেন, তাহার ভিতরে একটি অভিনব চিত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুলতার সম্বন্ধে নারীর মহিমময়ী মাতৃমূর্তি। আমরা শকুন্তলা নাটকের প্রথম অঙ্কে দেখিয়াছি, অনসূয়াকে শকুন্তলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশ্রম-তরুলতাগুলি সম্বন্ধে বলিয়াছিল,—'ণ কেঅলং তাদ-ণিওও এব্ব, অত্থি মে সোদরসিণেহ বি এদেসু।'—শুধু তাত কণ্বের নিয়োগই যে একমাত্র কথা তাহা নহে, আমার নিজেরও ইহাদের প্রতি একটা সোদর স্নেহ রহিয়াছে। এই বলিয়া শকুন্তলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুলতার মূলে কক্ষের কলসী হইতে জল সেচন করিয়াছিল। অন্যত্র কবি বলিতেছেন, এই জল-সিঞ্চন যেন মাতৃবক্ষের স্নেহ সিঞ্চন,—যেন ঘটরূপ স্তন হইতে মাতৃবক্ষের দুগ্ধ সিঞ্চন। 'কুমার-সম্ভবে' তপস্বিনী উমার ভিতরে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কুমারীর সেই মহিমময়ী মাতৃমূর্তি।—

অতন্দ্রিতা সা স্বয়মেব বৃক্ষকান্
ঘটস্তনপ্রস্রবণৈ র্ব্যবর্ধয়ৎ।
গুহোঽপি যেষাং প্রথমাপ্তজন্মনাং
ন পুত্রবাৎসল্যমপাকরিষ্যতি॥ (৫।১৪)

অতন্দ্রিতা তপস্বিনী উমা ঘটরূপ স্তনের প্রস্রবণ দ্বারা নিজেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষগুলিকে বাড়াইয়া তুলিতে লাগিল। সেই বৃক্ষ-শিশুদের উপরে কুমারী উমার এমন পুত্রবাৎসল্য জন্মিয়া গিয়াছিল যে, পরবর্তী কালে কুমার কার্তিকও সে পুত্রবাৎসল্য হ্রাস করিতে পারে নাই। 'রঘুবংশে'র ভিতরেও দেখিতে পাই মায়াসিংহ রাজা দিলীপকে বলিতেছে,—

অমুং পুরঃ পশ্যসি দেবদারুং
পুত্রীকৃতোঽসৌ বৃষভধ্বজেন।
যো হেমকুম্ভস্তননিঃসৃতানাং
স্কন্দস্য মাতুঃ পয়সাং রসজ্ঞঃ॥ (২।৩৬)

'ঐ দূরে দেবদারু দেখিতেছেন কি? বৃষভধ্বজ শিব উহাকে নিজের পুত্র করিয়া লইয়াছেন। এই দেবদারু গাছ কুমার স্কন্দের মাতা পার্বতীর হেমকুম্ভরূপ স্তন হইতে নিঃসৃত দুগ্ধধারার আস্বাদ লাভ করিতে পারিয়াছে।' নারীর মাতৃহৃদয়ের সহিত প্রকৃতিমায়ের দুলাল এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষলতাদির সহিত যে কি নিবিড় সংযোগ থাকিতে পারে তাহা এমন করিয়া আর কোথাও দেখিতে পাই নাই; —'হেমকুম্ভ-স্তন-নিঃসৃতানাং পয়সাং রসজ্ঞঃ!' ইহার ভিতর দিয়া যে শুধু প্রকৃতির সহিত মানুষের গভীর আত্মীয়তাই প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নহে,—ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে বিশ্ব-নারী-হৃদয়ে সঞ্চিত অফুরন্ত মাতৃত্বের স্নেহময়ী মহিমময়ী মূর্তি। পরের শ্লোকেই দেখিতে পাই,—

কণ্ডূয়মানেন কটং কদাচিৎ
বন্যদ্বিপেনোন্মথিতা ত্বগস্য।
অথৈনমদ্রেস্তনয়া শুশোচ
সেনান্যমালীঢ়মিবাসুরাস্ত্রৈঃ॥ (২।৩৭)

একদিন একটি বন্যহস্তী গাত্র ঘর্ষণ করিয়া এই দেবদারুর ত্বক্ উন্মথিত করিয়া দিয়াছিল,—তাহাতে গিরিদুহিতা পার্বতী ইহার জন্য ঠিক তেমন করিয়াই শোক করিয়াছিলেন, যেমন শোক করিয়াছিলেন তিনি অসুরগণ কর্তৃক ক্ষতবিক্ষত কুমার কার্তিকের অঙ্গ দেখিয়া।

বনে নির্বাসিত সীতাকেও মহর্ষি বাল্মীকি বলিয়াছিলেন,—

পয়োঘটৈরাশ্রমবালবৃক্ষান্
সংবর্ধয়ন্তী স্ববলানুরূপৈঃ।
অসংশয়ং প্রাক্তনয়োপপত্তেঃ
স্তনন্ধয়-প্রীতিমবাপ্স্যসি ত্বম্॥ (১৪।৭৮)

হে সীতা, তুমি নিজের বলের অনুরূপ জলঘটের দ্বারা আশ্রমের বালবৃক্ষগুলিকে বাড়াইয়া তুলিয়া নিশ্চয়ই সন্তান জন্মের পূর্বে স্তন্যদানের প্রীতি লাভ করিবে। স্নেহময়ী নারীর পক্ষে বালবৃক্ষকে ছোট্ট কলসীর জলে বাড়াইয়া তুলিবার ভিতরে কি যে একটা অনির্বচনীয় মাধুর্যভরা মহিমা রহিয়াছে, তাহা কবি কালিদাসের চোখে যেমন করিয়া পড়িয়াছিল, তেমন বুঝি আর কাহারও চোখে পড়ে নাই।

জড়প্রকৃতি যে শুধু বাহিরের রূপেই মানুষ তথা সমগ্র প্রাণি-জগতের সমকক্ষ হইয়া ওঠে তাহা নহে,—মনুষ্যত্বের মহত্তর গুণগুলিতেও মানুষের সহিত এই জড়-প্রকৃতির রহিয়াছে যে সাধর্ম্য তাহা কালিদাসের দৃষ্টি এড়ায় নাই। 'রঘুবংশে'র ভিতরে দেখিতে পাই মহারাজ দিলীপ প্রজাগণের সর্ববিধ হিতের জন্যই প্রজাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন। কবি বলিতেছেন যে প্রকৃতির ভিতরেও ইহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।—

সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ॥ (১।১৮)

সূর্য যেমন পৃথিবীর যেখানে আছে যত কিছু অপরিষ্কৃত, অপরিশুদ্ধ,

দুর্গন্ধযুক্ত জল সকল নিজের কিরণরূপ রাজকর্মচারিগণের সাহায্যে গ্রহণ করে,—কিন্তু প্রতিদানে ফিরাইয়া দেয় যে স্বচ্ছ শুদ্ধ বারিধারা তাহা গৃহীত ধনের সহস্রগুণ বেশী। 'রঘুবংশে'র চতুর্থ সর্গেও দেখিতে পাই, রাজা রঘু প্রজাদের নিকট হইতে যত কিছু সম্পদ্ গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া দক্ষিণাস্বরূপে সেই সমস্ত ধনই আবার প্রদান করিয়াছিলেন। কবি বলিতেছেন, সৎব্যক্তি যাঁহারা তাঁহারা প্রদানের জন্যই গ্রহণ করেন,—যেমন বাষ্পরূপে গ্রহণকারী এবং ধারাসার রূপে বর্ষণকারী মেঘ।

স বিশ্বজিতমাজহ্রে যজ্ঞং সর্বস্ব-দক্ষিণম্।
আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব॥ (৪।৮৬)

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র পঞ্চম অঙ্কে দেখিতে পাই,—যূথপতি হস্তী যেমন সারাদিন প্রখর রৌদ্রে যূথ চরাইয়া মধ্যাহ্নে একটু ছায়াতলে আসিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করে, মহারাজ দিলীপও তেমনই সারাদিন রাজকার্য করিয়া একটু বিশ্রামের জন্য অন্দরে গিয়াছেন। এখনই আবার রাজাকে আশ্রম হইতে সমাগত মুনিগণ ও শকুন্তলার সংবাদ জানাইতে কঞ্চুকী ইতস্তত করিতেছিল; কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবিল, 'অথবা অবিশ্রমো লোকতন্ত্রাধিকারঃ'—লোকতন্ত্রাধিকারের আর বিশ্রাম নাই।—

ভানুঃ সকৃদ্‌যুক্ততুরঙ্গ এব
রাত্রিন্দিবং গন্ধবহঃ প্রয়াতি।
শেষঃ সদৈবাহিত-ভূমিভারঃ
ষষ্ঠাংশবৃত্তেরপি ধর্ম এষঃ॥

সূর্য একবার যে রথে অশ্ব-যোজনা করিয়াছেন, আর ক্লান্ত হন নাই,—গন্ধবহ রাত্রিদিনই প্রবাহিত হইতেছে, শেষনাগ সর্বদার জন্যই মস্তকে

ভূমিভার বহন করিতেছে, ষষ্ঠাংশবৃত্তি রাজারও ইহাই ধর্ম। ইহার পরে বৈতালিক রাজা দুষ্মন্তের যশোগান করিতেছে,—

স্ব-সুখ-নিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ
প্রতিদিনমথবা তে সৃষ্টিরেবংবিধৈব।
অনুভবতি হি মূর্দ্ধা পাদপস্তীব্রমুষ্ণং
শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্॥

হে মহারাজ, নিজের সুখে নিরভিলাষ হইয়া আপনি প্রতিদিন প্রজাগণের জন্য ক্লেশ বরণ করিতেছেন,—অথবা আপনার ন্যায় ব্যক্তিগণের জন্ম যেন এইরূপ কাজ করিবারই জন্য,—পাদপ নিজে মাথা পাতিয়া প্রখর সূর্যকিরণ সহ্য করে ;—কিন্তু তাহার নীচে যাহারা আশ্রয় গ্রহণ করে তাহাদের গায়ে সে এতটুকুও তাপ লাগিতে দেয় না,—নিজের শীতল ছায়ায় সব ঢাকিয়া রাখে। শার্ঙ্গরবও রাজা দুষ্মন্তের বিনয় দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—

ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলাগমৈঃ
নবাম্বুভির্দূরবিলম্বিনো ঘনাঃ।
অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ
স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্॥

তরুগণ ফলাগমে নুইয়া পড়ে,—নবজলভারে মেঘগুলি নুইয়া পড়ে,—সমৃদ্ধিতে সৎপুরুষগণ অনুদ্ধত হন,—পরোপকারিগণের ইহাই স্বভাব।

বিমূর্ত মানসিক অবস্থা প্রকাশে কালিদাসের উপমা

উপমার কথা আলোচনা করিতে গিয়া আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে উপমা ভাষার চিত্রধর্ম, এবং এ কথাটিও আমরা স্পষ্ট করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, আমাদের বোঝা-ক্রিয়াটি সম্পূর্ণ না হইলেও অনেকখানিই নির্ভর করে ভাষার চিত্রধর্মের উপরে। একেবারে শুদ্ধ শব্দজন্য জ্ঞানের মতবাদকে আমরা ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে মানিয়া লইতে পারি না। তা ছাড়া এ কথারও আমরা আভাস দিয়াছি যে, এই শুদ্ধ 'শব্দে'র ইতিহাসের পশ্চাতেই কোথায় যে লুকাইয়া আছে প্রাকৃতিক কোন বস্তু বা ঘটনার অনুকৃতি তাহাও আজ আমরা হয়ত ভুলিয়া গিয়াছি,—আজ হয়ত বায়ুমণ্ডলের ধ্বনি-কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে তাহা আমাদের অবচেতন-লোকে দোলা দিতেছে। অবশ্য বস্তুকে আমরা যখন বুঝি তখন সেই জ্ঞানক্রিয়ার ভিতরে বস্তুর বাস্তব রূপটিই থাকে, অথবা শুধু তাহার সম্বন্ধে গঠিত মানসিক বৃত্তিটিই থাকে, অথবা তাহাকে আমরা শুধু শব্দজন্য জ্ঞানের দ্বারাই বুঝিয়া লই, ইহা লইয়া পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। কিন্তু সে সকল সূক্ষ্ম তর্কজালের ভিতরে প্রবেশ না করিয়াও সাধারণ বুদ্ধিতে দেখিতে পাই,—সেই জিনিসকেই আমরা বুঝিতে পারি সবচেয়ে ভাল করিয়া যাহা আমাদের মানসলোকে ভাসিয়া উঠে একান্ত প্রত্যক্ষ হইয়া। এই জন্যই আমাদের বস্তু-বিয়োজিত অমূর্ত (abstract) চিন্তাগুলিকে আমরা যতই রূপের ভিতরে মূর্ত করিয়া তুলিতে পারি,—আমাদের বোঝা-ক্রিয়াটি ততই সহজ হইয়া আসে। এই প্রত্যক্ষীকরণের জন্যই উপমাদি অলঙ্কার আঁকিতে থাকে ছবির উপর ছবি। এমন কি সাধারণ চিত্তবৃত্তিকেও আমরা যখন একটা বাস্তব চিত্রের ভিতর দিয়া রূপ দিতে পারি তখনই তাহা আমাদের নিকট সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' দেখিতে পাই,—শকুন্তলার সহিত প্রথম সাক্ষাতের পরে রাজা দুষ্যন্তের আর নগরে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না ; হৃদয় যেন পশ্চাতে আশ্রমবাসিনী শকুন্তলাতেই আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে, অথচ শরীরটিকে লইয়া আগাইয়া চলিতে হইতেছে। মনের এই প্রতিকূল অবস্থাটিকে কালিদাস একটি মাত্র উপমার সাহায্যে বুঝাইলেন—

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥

শরীর অগ্রের দিকে চলিয়াছে,—অসংস্থিত চিত্ত পশ্চাতের দিকে ধাবিত হইতেছে,—ঠিক যেন একটি অগ্রে নীয়মান পতাকার সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র প্রতিকূল বাতাসে চালিত হইতেছে। নবপ্রণয়াসক্ত মনের প্রতিটি সূক্ষ্ম স্পন্দন যেন ঐ প্রতিকূল বাতাসে নীয়মান চীনাংশুকের প্রতিটি কম্পনে আমাদের নিকটে ধরা পড়িয়াছে।

পঞ্চম অঙ্কে আর্যা গৌতমী এবং শাঙ্গর্রব প্রভৃতি মুনিগণ শকুন্তলাসহ যখন রাজ-সভায় প্রবেশ করিয়া দুষ্যন্তের পূর্ববিবাহিতা পত্নী বলিয়া শকুন্তলার পরিচয় দিলেন, রাজা শকুন্তলাকে চিনিতে পারিলেন না,—কিন্তু শকুন্তলার অনুপম রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে ত্যাগও করিতে পারিতেছিলেন না ; শকুন্তলা পূর্ববিবাহিতা পত্নী কিনা স্মরণ না হওয়ায় তাহাকে গ্রহণ করাও যাইতেছে না। রাজার সেই মানসিক অবস্থা ঠিক যেন একটি অন্তস্তুষার কুন্দের চারিপাশে ঘুরিয়া মরা ভ্রমরের মত। কুন্দের অন্তঃস্থিত তুষারের জন্য তাহার বুকের মধুকে ভ্রমর ভোগ করিতেও পারিতেছে না, আবার কুন্দের মধুলোভে আকৃষ্ট ভ্রমর তাহাকে কিছুতেই ত্যাগও করিতে পারিতেছে না। একটা বিস্মৃতির তুষারে যেন শকুন্তলা রূপ কুন্দফুলটির বুক ঢাকা পড়িয়াছে,

—তাই তাহাকে গ্রহণ করাও যাইতেছে না,—আবার সেই অনুপম কান্তিমাধুর্যকে যেন ত্যাগ করাও যাইতেছে না।

ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি
প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্ন বেতি ব্যবস্যন্।
ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তুষারং
ন চ খলু পরিভোক্তুং নৈব শক্নোমি হাতুম্॥

স্মারক অঙ্গুরী পাইয়া শকুন্তলা-বিরহে কাতর দুষ্যন্ত বিদূষককে বলিতেছেন,—শকুন্তলার সহিত আমার সমাগম স্বপ্ন কি মায়া অথবা মতিভ্রম—কিছুই বুঝিতে পারিলাম না,—অথবা সে সমাগম যেন পরিক্ষীণ কিঞ্চিৎ পুণ্যের ফল মাত্র; সেই শকুন্তলা আর ফিরিবে না, সমস্তই এখন অতীত,—আর শকুন্তলা সম্বন্ধে আমার সকল মনোবথই এখন তট-প্রপাতের মত।

স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু
ক্লিষ্টং নু তাবৎফলমেব পুণ্যম্।
অসন্নবৃত্ত্যৈ তদতীতমেতে
মনোরথা নাম তটপ্রপাতা॥

প্রতিকূল স্রোতের আঘাতে তটভূমি যেমন একটির পরে একটি করিয়া ভাঙিয়া পড়ে, শকুন্তলা সম্বন্ধে সকল অভিলাষও এখন তেমনই একটার পর একটা ভাঙিয়া পড়িবে।

এই নাটকেরই শেষের দিকে দেখিতে পাই,—রাজা দুষ্যন্ত মহর্ষি মারীচের নিকট বলিতেছেন,—আমি শকুন্তলাকে দেখিয়া, তাহার মুখে সকল পূর্বকাহিনী শুনিয়াও কিছুই স্মরণ করিতে পারিলাম না, শেষে অঙ্গুরী দর্শনে আমার সকল স্মৃতি ফিরিয়া আসিল। ঠিক যেন,—

যথা গজো নেতি সমক্ষরূপে
তস্মিন্নতিক্রামতি সংশয়ঃ স্যাৎ।

পদানি দৃষ্ট্বা তু ভবেৎ প্রতীতি-
স্তথাবিধো মে মনসো বিকারঃ ॥

হাতীটি যখন সমক্ষে আসিল তখন মনে হইল ইহা হাতী নয়; সে যখন অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল, তখন মনে সংশয় আসিল; তারপরে পদচিহ্ন দেখিয়া প্রতীতি জন্মিল যে ইহা হাতী!—আমার মনের বিকারও ঠিক সেইরূপ। হাতীটিকে সম্মুখে দেখিয়া চিনিলাম না,—শুধু পদচিহ্ন দেখিয়া চিনিলাম, যে সম্মুখ হইতে চলিয়া গিয়াছে সে একটি হাতী! সমক্ষে আসিয়া রাজসভায় সেই শকুন্তলা দাঁড়াইয়াছিল,—কত পূর্ব-পরিচয় দিয়াছিল,—কিছুতেই সেদিন তাহাকে চিনিলাম না, কিন্তু পরে তাহাকে চিনিলাম হাতের আঙটিটি দেখিয়া।

মহর্ষি মারীচের আশ্রমে ধৃতৈকবেণী তপস্বিনী শকুন্তলার পদতলে পড়িয়া দুষ্যন্ত বলিয়াছিলেন,—

সুতনু হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশ-ব্যলীকমপৈতু তে
কিমপি মনসঃ সম্মোহো মে তদা বলবানভূৎ।
প্রবলতমসামেবংপ্রায়াঃ শুভেষু হি বৃত্তয়ঃ
স্রজমপি শিরস্যন্ধঃ ক্ষিপ্তাং ধুনোত্যহিশঙ্কয়া ॥

হে সুতনু, প্রত্যাখ্যান-জনিত দুঃখ এবং ক্ষোভ হৃদয় হইতে দূর করিয়া দাও,—তখন কি জানি কি একটা সম্মোহ আমার মনে বলবান হইয়া উঠিয়াছিল। প্রবল তমসাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের শুভকার্যে এইরূপই মনের অবস্থা হইয়া থাকে,—অন্ধের মাথায় কুসুমের মালা জড়াইয়া দিলেও সে সর্প-আশঙ্কায় দূরে ছুড়িয়া ফেলে।

'মেঘদূতে'র ভিতরে বিরহী যক্ষ মেঘকে বলিতেছে,—

তাঞ্চাবশ্যং দিবসগণনাতৎপরামেকপত্নী-
মব্যাপন্নামবিহতগতির্দ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম্।

আশাবন্ধঃ কুসুম-সদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রযোগে রুণদ্ধি ॥ (পূঃ।১০)

হে মেঘ, অবাধগতিতে চলিয়া গিয়া তোমার পতিব্রতা ভ্রাতৃবধূকে দেখিতে পাইবে ; সে এখন পর্যন্ত জীবিতই আছে,—এবং আমার জন্য দিবস গণনায় ব্যাপৃত আছে। বৃন্ত যেন পতনোন্মুখ পুষ্পকেও মাটিতে ঝরিয়া পড়িতে দিতে চাহে না,—ওই বৃন্তের সহিত এবং পতনোন্মুখ পুষ্পের সহিত রহিয়াছে যে একটি দৃষ্টি-মনের অগোচর রহস্যময় সম্বন্ধ, তাহাই যেন বিরহি-হৃদয়ের আশার রূপ।

'কুমার-সম্ভবে' দেখিতে পাই, মহাদেব বটু ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে আসিয়া কঠোর তপস্যারত উমাকে তপস্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য প্রচুর শিবনিন্দা করিতেছেন। উমা প্রথমে বহু প্রতিবাদ করিয়াছে, কিন্তু প্রগল্‌ভ চপল ব্রাহ্মণ কিছুতেই নিরস্ত হইতেছে না দেখিয়া সেখান হইতে উমা অন্যত্র চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল ; কিন্তু বেগবশে তাহার স্তন-বল্কল খসিয়া গেল, মহাদেব তখন নিজমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সহাস্যে উমাকে ধারণ করিলেন। তখন,—

তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টি-
র্নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী।
মার্গাচল-ব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ
শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ ॥ (৫।৮৫)

মহাদেবকে সম্মুখে দেখিয়া ঘর্মাক্তকলেবরা কম্পান্বিতা গিরিরাজনন্দিনী অগ্রে নিক্ষেপের জন্য চরণ উর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া আর যেন যাইতেও পারিল না, থাকিতেও পারিল না,—ন যযৌ ন তস্থৌ। ঠিক যেন পথমধ্যে পর্বতের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ-গতি একটি ব্যাকুলা নদী। উমার অন্তরে যুগপৎ প্রবাহিত ক্রোধ, আনন্দ, লজ্জা এবং সঙ্কোচ ; সে

যেন কাহাকেও প্রকাশও করিতে পারিতেছে না, রুধিয়া রাখিতেও পারিতেছে না, সম্মুখে দাঁড়াইয়া মহেশ্বর কল-প্রবাহিতা সিন্ধুর মুখে অচল পাষাণ-স্তূপের ন্যায়। উমার যে শুধু বাহিরের গতিতেই বাধা পড়িয়াছে তাহা নহে, বাধা পড়িয়াছে তাহার অন্তরের প্রবাহেও, তাই পর্বত-প্রতিরুদ্ধা নদীর ন্যায় গিরিরাজসুতা 'ন যযৌ ন তস্থৌ।' সহসা পর্বতের দ্বারা প্রতিরুদ্ধগতি নদীর যেমন আর সম্মুখে অগ্রসর হইতে না পারিয়া অন্তর্বেগে শুধু আপনার ভিতরে উপছাইয়া উঠিতে থাকে, গিরিরাজ-সুতা উমার তেমনই অন্তর্নিবদ্ধ ভাব-সম্বেগ শুধু যেন উপছাইয়া উঠিতেছিল।

'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র ভিতরে দেখিতে পাই, বিদূষক যখন অদূরে দণ্ডায়মানা মালবিকার সন্ধান বলিল, তখন রাজা বলিলেন,—

ত্বদুপলভ্য সমীপগতাং প্রিয়াং
হৃদয়মুচ্ছ্বসিতং মম বিক্লবম্।
তরুবৃতাং পথিকস্য জলার্থিনঃ
সরিতমারসিতাদিব সারসাৎ॥

তোমার নিকটে সমীপগতা প্রিয়ার কথা শুনিয়া আমার কাতর হৃদয় আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, ঠিক যেন পিপাসার্ত জলান্বেষী পথিকের পক্ষে সারসের রবে সমীপবর্তী তরুরাজি-সমাবৃত জলাশয়ের সন্ধান লাভের মত!

'বিক্রমোর্বশী'তে দেখি, মূর্ছাভঙ্গের পর উর্বশীর বরতনু যেন তট-পতন-কলুষা গঙ্গার পুনরায় প্রশান্ত মূর্তি।

মোহেনান্তর্বরতনুরিয়ং লক্ষ্যতে মুচ্যমানা।
গঙ্গা রোধঃপতনকলুষা গচ্ছতীব প্রসাদম্॥

আবার উর্বশী যখন আকাশে অন্তর্হিত হইল তখন রাজা বিক্রম বলিতেছেন,—

এষা মনো মে প্রসভং শরীরাৎ
পিতুঃ পদং মধ্যমমুৎপতন্তী।
সুরাঙ্গনা কর্ষতি খণ্ডিতাগ্রাৎ
সূত্রং মৃণালাদিব রাজহংসী ॥

সুরাঙ্গনা উর্বশী আমার দেহ হইতে মনটিকে ঠিক তেমনি করিয়াই টানিয়া লইতেছে, যেমন করিয়া রাজহংসী টানিয়া লয় সূক্ষ্ম মৃণাল-সূত্রগুলি খণ্ডিতাগ্র মৃণালের ভিতর হইতে।

'রঘুবংশে'র ভিতরে দেখি, একটি সুরাঙ্গনা যখন হরিণীর রূপ ধরিয়া তাহার কামোদ্দীপক বিলাস-বিভ্রমে তপোমগ্ন ঋষির চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটাইয়া তপস্যার বিঘ্নোৎপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন তপঃ-প্রভাবে ঋষি সকলই জানিতে পারিলেন এবং তাঁহার ধ্যান-সমাহিত প্রশান্ত চিত্তে সহসা ক্রোধের উদ্রেক হইল, ঋষি তাহাকে শাপ দিলেন। তপোমগ্ন ঋষির যোগ-সমাহিত চিত্তে এই তপোভঙ্গজনিত ক্রোধের বিক্ষেপ যেন প্রশান্ত সাগর-বেলায় প্রলয়ের তরঙ্গাঘাত।

স তপঃপ্রতিবন্ধমন্যুনা
প্রমুখাবিষ্কৃতচারুবিভ্রমাম্।
অশপদ্ভব মানুষীতি তাং
শমবেলা-প্রলয়োর্মিণা ভুবি ॥ (৮।৮০)

'রঘুবংশে'র অন্যত্র দেখিতে পাই, অভিশাপমুক্ত গন্ধর্ব-কুমার রাজা অজকে বলিতেছে,—

স চানুনীতঃ প্রণতেন পশ্চাৎ
ময়া মহর্ষির্মৃদুতামগচ্ছৎ।

উষ্ণত্বমগ্ন্যাতপসংপ্রয়োগাৎ
শৈত্যং হি যৎ সা প্রকৃতির্জলস্য ॥ (৫।৫৪)

আমি প্রণত হইয়া পরে যখন মহর্ষির নিকটে অনুনয় করিলাম তিনি মৃদুতা অবলম্বন করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন ; জলের যে উষ্ণত্ব তাহা অগ্নি-সংযোগেই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু শীতলতাই জলের প্রকৃতি। এখানে স্বভাব-শীতল তপস্বি-প্রকৃতিটি আমাদের স্পর্শযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

আকাশগামী নারদের বীণা হইতে চ্যুত দিব্য মালা স্পর্শে অচেতনা ইন্দুমতীকে কোলে স্থাপন করিয়া রাজা অজ বলিতেছেন,—

তদপোহিতুমর্হসি প্রিয়ে
প্রতিবোধেন বিষাদমাশু মে।
জ্বলিতেন গুহাগতং তমঃ
তুহিনাদ্রেরিব নক্তমোষধিঃ ॥ (৮।৫৪)

হে প্রিয়ে, তুমি তোমার চেতনার উজ্জীবনের দ্বারা এখনই আমার সমস্ত বিষাদ দূর করিয়া দিতে পার ; যেমনভাবে রজনীতে ওষধি সহসা প্রজ্বলনের দ্বারা হিমালয়ের গুহাগত তমোরাশি মুহূর্তে দূর করিয়া দেয়।

ত্রয়োদশ সর্গে সীতাকে পাশে করিয়া বিমানপথে অযোধ্যার অভিমুখে ফিরিবার কালে শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে বলিতেছেন,—

ক্বচিৎ পথা সঞ্চরতে সুরাণাং
ক্বচিদ্ ঘনানাং পততাং ক্বচিচ্চ।
যথাবিধো মে মনসোঽভিলাষঃ
প্রবর্ততে পশ্য তথা বিমানম্ ॥ (১৩।১৯)

হে সীতা, আমাদের এই বিমান কখনও আকাশে দেবতাগণের পথে চলিতেছে,—কখনও মেঘের পথে চলিতেছে,—কখনও আবার বিহঙ্গম-

গণের বিচরণ পথে ; আজ আমার মনের অভিলাষগুলি যেমন করিয়া ঘুরিয়া বঙ্কিমগতিতে চলিতেছে,—তেমনিতর ভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে আমাদের বিমানটিও। আজ সীতা উদ্ধার করিয়া চতুর্দশবর্ষ পরে তাহাকেই পাশে রাখিয়া রামচন্দ্র অযোধ্যার অভিমুখে চলিয়াছেন,—তাহার বঙ্কিমগতিতে বহু পথে ঘুরিয়া ফেরা অভিলাষগুলি যেন বাস্তব-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে ঐ বহুপথে বিচরণকারী বিমানটির ভিতরে।

যাহাকে আমরা সাধারণত বস্তু-বিয়োজিত গুণ বলিয়া একেবারে রূপ-বর্ণহীন বলিয়া মনে করি, তাহাদের বাহিরে কোন রূপ বা বর্ণ নাই সত্য, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মনের ভিতরে তাহাদেরও রূপ এবং বর্ণ থাকে। অনেক স্থানে অবশ্য এই সকল গুণের রূপ বা গুণ দ্রব্যান্তরিত-বিশেষণ মাত্র (transferied epithet)। যেমন আমাদের বিষাদমগ্ন মুখের ম্লানিমা লইয়া আমাদের দুঃখের রূপ কালো হইয়া উঠিয়াছে,—আমাদের ব্রীড়ারক্তিম মুখের রাঙিমা মাখিয়া লজ্জা নিজেই যেন লাল হইয়া উঠিয়াছে,—আমাদের আনন্দোজ্জ্বল মুখকান্তির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া আমাদের হাসি শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে। সংস্কৃত আলঙ্কারিক মতে যাহা 'কবি-সময়' বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে তাহা অনেকক্ষেত্রেই এই দ্রব্যান্তরিত বিশেষণ। 'রঘুবংশে'র ভিতরে দেখিতে পাই, রাজকুমার অজ প্রতিদ্বন্দ্বী রাজন্যবর্গকে পরাস্ত করিয়া দিয়া বিজয় শঙ্খ বাজাইয়া দিলেন। কবি বলিতেছেন,—রাজকুমার যখন বিজয়বার্তা ঘোষণা করিবার জন্য নিজের অধরোষ্ঠ শুভ্র শঙ্খের মুখে ন্যস্ত করিলেন, তখন মনে হইতেছিল,—বীর কুমার যেন স্বহস্তোপার্জিত মূর্ত যশোরাশিকেই পান করিতেছিলেন।—

> ততঃ প্রিয়োপাত্তরসেঽধরোষ্ঠে
> নিবেশ্য দধ্মৌ জলজং কুমারঃ।

তেন স্বহস্তার্জিতমেকবীরঃ

পিবন্ যশো মূর্তমিবাবভাসে ॥ (৭।৬৩)

শ্বেতবর্ণের শঙ্খটি যেন মূর্ত শুভ্র যশোরাশি। শুধু যে এইখানে উৎপ্রেক্ষাটির সকল মাধুর্য তাহা নহে ; একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, রাজকুমার অজের যশোরাশি যেমন একটি ধবল শঙ্খে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, তেমনি অজের শৌর্য-বীর্যের অনেকখানি প্রকাশ যেন এই একটিমাত্র উৎপ্রেক্ষার ভিতরে জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। 'রঘুবংশে'র দ্বিতীয় সর্গেও দেখিতে পাই, বশিষ্ঠের আশ্রমে বশিষ্ঠের আদেশ পাইয়া অতিতৃষ্ণ রাজা দিলীপ নন্দিনীর বৎসের পীতাবশিষ্ট দুগ্ধ পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। নন্দিনীর সেই শুভ্র দুগ্ধধারা পান করিয়া রাজা যেন মূর্ত যশোরাশিকেই পান করিলেন।

স নন্দিনীস্তন্যমনিন্দিতাত্মা

সদ্বৎসলো বৎস-হুতাবশেষম্।

পপৌ বশিষ্ঠেন কৃতাভ্যনুজ্ঞঃ

শুভ্রং যশো মূর্তমিবাতিতৃষ্ণঃ ॥ (২।৬৯)

'রঘুবংশ' চতুর্থ সর্গে দেখিতে পাই,—বীরকেশরী রঘুরাজ শরতের সমাগমে বিজয়-অভিযান করিয়াছেন। তখন,—

হংসশ্রেণীষু তারাসু কুমুদ্বৎসু চ বারিষু।

বিভূতয়স্তদীয়ানাং পর্যস্তা যশসামিব ॥ (৪।১৯)

শ্বেত হংসমালা, শ্বেত নক্ষত্ররাজি, শুভ্র কুমুদ পুষ্প, শরতের শুভ্র জলরাশি,—সকলের ভিতরে যেন রাজা রঘুর যশোবিভূতিই বিকীর্ণ হইয়া আছে।

কিন্তু আমাদের :এইজাতীয় অশরীরী গুণ বা মানসিক ভাবগুলি কখন্ যে কোন্ বস্তুর সঙ্গে একটা নিত্যসম্বন্ধ হেতু বিশেষরূপ বা বর্ণ

পরিগ্রহ করে, তাহা অতি কৌতূহলপ্রদ। সম্পদের অধিষ্ঠাতৃদেবী লক্ষ্মী রক্তকমলবর্ণা,—বিদ্যার অধিষ্ঠাতৃদেবী সরস্বতী কুন্দেন্দুধবলা। ইহার পশ্চাতে সূক্ষ্ম কারণ রহিয়াছে। সম্পদের ভিতরে আছে যে তরল আনন্দ, যে গর্বান্ধ মত্ততা, যে রজোগুণের উত্তেজনা সে আমাদের চিত্তকে নাড়া দেয় ঠিক সেই ভাবে, যেভাবে রক্ত-কমলবর্ণ আমাদের চিত্তে দেয় স্পন্দন। আবার জ্ঞানের ভিতরে যে স্বচ্ছতা, যে বিশুদ্ধতা, যে সাত্ত্বিক ঔজ্জ্বল্য—যে গভীর প্রশান্তি রহিয়াছে সে আমাদের চিত্তকে প্রশান্ত করিয়া তোলে ঠিক সেই ভাবে যেভাবে আমাদের চিত্তকে নির্মল প্রশান্তিতে ভরিয়া দেয় কুন্দেন্দুধবল কান্তি। তাই ত দেখি কবি উমার প্রাক্তন বিদ্যার তুলনা করিলেন শরতের গঙ্গায় শুভ্র হংসমালার সঙ্গে আর রজনীতে ওষধির আত্মভাসের সঙ্গে।

অলঙ্কারে সামান্য হইতে বিশেষ ও বিশেষ হইতে সামান্যে যাতায়াত

উপমা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে আর একটি জিনিস বেশ সহজে চোখে পড়ে যে, আমরা সাধারণ বা সামান্য (General) সত্যকে খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি না যতক্ষণ তাহাকে বিশেষের ভিতর প্রত্যক্ষ করিয়া না পাই। যে দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ঘনজালের ভিতরে মন একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া ওঠে,—সে যেন মুক্তি পায় ছোট্ট একটি উপমার ভিতর দিয়া। ইহার কারণ, মানুষ 'বিশেষ' হইতে বিয়োজিত 'সামান্য' লইয়া চিন্তা করিতে অভ্যস্ত নহে ; এই মানসিক বিয়োজনের (Abstraction) ভিতরেই আছে মনের উপরে একটা বল-প্রয়োগ,—যাহা সাধারণ মনের পক্ষে ক্লেশ-সাধ্য। এই জন্যই সামান্য

হইতে বিশেষে গিয়া শুধু আমাদের বোঝা জিনিসটিই যে সহজ হইয়া ওঠে তাহা নয়,—'বোঝন'-ক্রিয়ার এই সহজত্বের ভিতর দিয়া আসিয়া পড়ে একটা সুখময়ত্ব—একটা হ্লাদ-জনকতা,—এই জন্যই তুলনা, উদাহরণ বা সমর্থন ব্যতীত আমাদের মন যেন কিছুই বুঝিয়া আরাম পায় না,—তাই সে বুঝিতেও চাহে না। আবার 'বিশেষ' সম্বন্ধে সম্যক্ প্রতীতি লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে 'বিশেষ' সমূহ হইতে লব্ধ যে 'সামান্য' তাহারই দ্বারস্থ হইতে হয়, সেই 'সামান্যে'র সমর্থনে 'বিশেষে'র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান স্পষ্টতর হইয়া ওঠে। এই জন্য আমাদের চিন্তার ভিতরে থাকে 'সামান্য' হইতে 'বিশেষে' এবং 'বিশেষ' হইতে 'সামান্যে' একটা নিরন্তর আসা-যাওয়া। পূর্বেই বলিয়াছি, এই জাতীয় 'বিশেষ' দ্বারা 'সামান্য'কে বা 'সামান্য' দ্বারা 'বিশেষ'কে, 'কারণ' দ্বারা 'কার্য'কে অথবা 'কার্য' দ্বারা 'কারণ'কে সমর্থন করাকে আলঙ্কারিকগণ 'অর্থান্তরন্যাস' নামে অভিহিত করিয়াছেন। কালিদাস অনেক সময়ে তাঁহার অলঙ্কার প্রয়োগের ভিতর দিয়া 'সামান্য'কে এইরূপে 'বিশেষে'র মধ্যে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন, আবার 'বিশেষ'কেও 'সামান্যে'র ভিতরে প্রকাশ করিয়া তুলিয়াছেন। 'কুমার-সম্ভবে'র প্রারম্ভে কবি বলিতেছেন যে, অনন্তরত্নপ্রসবকারী হিমালয়ের তুষার ইহার সৌন্দর্য-বিলোপী হইয়া ওঠে নাই; কেননা বহু গুণের মধ্যে একটি দোষ ডুবিয়া যায়,—যেমন চন্দ্রকিরণ-রাশির ভিতরে তাহার কলঙ্ক-চিহ্ন।

> অনন্ত-রত্ন-প্রভবস্য যস্য
> হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্।
> একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
> নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ॥ (১।৩)

এখানে দেখিতেছি, প্রথমত 'হিম যে অনন্ত-রত্ন-প্রসূ হিমালয়ের সৌন্দর্য-বিলোপি হইতে পারে নাই' এই 'বিশেষ'কে সমর্থন করা হইল 'একদোষ গুণসমূহের মধ্যে ডুবিয়া যায়' এই 'সামান্য' দ্বারা ; আবার এই 'সামান্য'কে সমর্থন করা হইয়াছে দ্বিতীয় একটি 'বিশেষে'র সাহায্যে— 'চন্দ্রের কিরণ সমূহের ভিতরে তাহার কলঙ্ক চিহ্ন যেমন ডুবিয়া যায়'।

'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র ভিতরে দেখিতে পাই,—মালবিকা গুরুর উপদিষ্ট অভিনয়াদি শিল্পকলায় অতি নিপুণা হইয়াছে। গুরু গণদাস বলিতেছেন,—

পাত্রবিশেষে ন্যস্তং গুণান্তরং ব্রজতি শিল্পমাধাতুঃ।
জলমিব সমুদ্রশুক্তৌ মুক্তাফলতাং পয়োদস্য ॥

শিল্পশিক্ষকের শিক্ষা যদি পাত্র বিশেষে ন্যস্ত হয় তবে তাহা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় ; মেঘের জল যেমন সমুদ্র-শুক্তির মধ্যে পতিত হইলেই মুক্তা ফল হইয়া ওঠে।

অন্যত্র রাজা অগ্নিমিত্র বিদূষককে বলিতেছেন,—

অর্থং সপ্রতিবন্ধং প্রভুরধিগন্তুং সহায়বানেব।
দৃশ্যং তমসি ন পশ্যতি দীপেন বিনা সচক্ষুরপি ॥

উপযুক্ত সহায় থাকিলেই প্রভু বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও নিজের অভিপ্রায় সাধন করিতে পারেন ; প্রদীপ না থাকিলে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিও অন্ধকারে দৃশ্য বস্তুকে দেখিতে পারে না। 'রঘুবংশে'র অজবিলাপের ভিতরে দেখিতে পাই,—

অথবা মৃদু বস্তু হিংসিতুং
মৃদুনৈবারভতে প্রজান্তকঃ।
হিমসেকবিপত্তিরত্র মে
নলিনী পূর্ব-নিদর্শনং মতা ॥ (৮।৪৫)

অথবা প্রজান্তক কাল মৃদু বস্তুকে মৃদুবস্তু দ্বারাই ধ্বংস করে ; শিশির সম্পাতে কমলের বিনাশই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কালিদাসের বহু অর্থান্তর-ন্যাস অলঙ্কার পরবর্তীকালে অনেকখানি প্রবাদবাক্যের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। যেমন 'মেঘদূতে' যক্ষ মেঘের কাছে নিজের প্রার্থনা জানাইয়া বলিতেছে—

যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা॥ (পূ, ৬)

অধিকগুণযুক্ত পুরুষের কাছে প্রার্থনা নিষ্ফল হইলেও ভাল, অধমের কাছে লব্ধকাম হইলেও ভাল নহে ;

মেঘদূতেরই অন্যত্র পাই—

আপন্নার্তিপ্রশমনফলাঃ সম্পদো হ্যুত্তমানাম্॥ (পূ, ৫৩)

'আপাদ্প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের আর্তির প্রশমনই হইল উত্তমগণের সম্পদ্'।

কে বা ন স্যুঃ পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ॥ (পূ, ৫৪)

'নিষ্ফল কার্যের জন্য উদ্যোগী কোন্ ব্যক্তি না তিরস্কারের আস্পদ হন?'

'কুমার-সম্ভবে' হিমালয়ের বর্ণনায় দেখি—

দিবাকরাদ্রক্ষতি যো গুহাসু
লীনং দিবাভীতমিবান্ধকারম্।
ক্ষুদ্রে ঽপি নূনং শরণং প্রপন্নে
মমত্বমুচ্চৈঃশিরসাং সতীব॥ (১৷১২)

'এই হিমালয় দিনভীতের ন্যায় গুহাগুলিতে লীন অন্ধকারকে সূর্য হইতে রক্ষা করে ; ক্ষুদ্রও আসিয়া উচ্চশির ব্যক্তিগণের শরণ গ্রহণ করিলে সজ্জনোচিত মমত্ব দেখা দেয়।'

হিমালয়ের যে নির্জন প্রদেশে মহাদেব তাঁহার যোগ-সাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন সেখানে পার্বতী আসিয়া পাদ্যাদি প্রভৃতি দ্বারা মহাদেবের

সেবা করিতেন। যোগতৎপর হইয়াও মহাদেব পার্বতীকে এই সেবা কার্যে বাধা দেন নাই—

প্রত্যর্থিভূতামপি তাং সমাধেঃ
শুশ্রূষমাণাং গিরিশো ঽনুমেনে।
বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ॥ (১।৫৯)

'গিরিশ পার্বতীকে সমাধির অন্তরায়ভূতা জানিয়াও শুশ্রূষমাণা তাহাকে অঙ্গীকার করিলেন, (কারণ) বিকারের হেতু থাকিতেও যাঁহাদের চিত্তের কোনও বিকার হয় না তাঁহারাই ত ধীর।'

মদনকে শিবের তপোভঙ্গের জন্য প্রয়োজন; সেই মদন যখন উপস্থিত হইল তখন ইন্দ্রের সহস্র নেত্র দেবতাগণকে পরিত্যাগ করিয়া মদনের উপরে পড়িল; কারণ—

প্রয়োজনাপেক্ষিতয়া প্রভূণাং
প্রায়শ্চলং গৌরবমাশ্রিতেষু॥ (৩।১)

'প্রায়ই দেখা যায়, প্রভুদের যে আশ্রিতজনের প্রতি গৌরব তাহা প্রয়োজনের অপেক্ষাতেই চঞ্চল—অর্থাৎ প্রয়োজন অনুসারেই হ্রাস-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।'

অকাল-বসন্তের বর্ণনায় দেখি—

বর্ণপ্রকর্ষে সতি কর্ণিকারং
দুনোতি নির্গন্ধতয়া স্ম চেতঃ।
প্রায়েণ সামগ্র্যবিধৌ গুণানাং
পরাঙ্মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ॥ (৩।২৮)

'কর্ণিকার বর্ণপ্রকর্ষ থাকিলেও নির্গন্ধতা হেতু চিত্ত সন্তপ্ত করিয়াছিল; দেখা যায় প্রায়ই বিশ্বস্রষ্টার প্রবৃত্তি গুণসমূহের সমগ্রতা বিধানে পরাঙ্মুখী।'

আবার দেখি, মেনকা অনেক রকম উপদেশ দিয়াও স্থিরসঙ্কল্পা কন্যা পার্বতীকে তপস্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না; কারণ—

ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ ॥ (৫।৫)

'অভীষ্ট অর্থে স্থির নিশ্চয় হইয়াছে যাহার মন, সেই মনকে, আর নিম্নাভিমুখী জলকে, কে প্রতিনিবৃত্তি করিতে পারে?' এখানে প্রতীপের সঙ্গেই অর্থান্তর ন্যাস হইয়াছে।

কালিদাসের উপমায় মৌলিকতা ও শুচিতা

কালিদাসের উপমার প্রধান মাহাত্ম্য তাহার বৈচিত্র্যে এবং মৌলিকতায়। কবি নিজের কল্পনাকে সীমাবদ্ধ কোন রাজপথ দিয়া চালাইয়া যান নাই। উত্তুঙ্গ পর্বত, দুর্গম অরণ্যানী, সীমাহীন বারিধি, বিরাট আকাশ, বন্ধনহীন বায়ু, তরুলতা, ফলফুল, পশুপক্ষী— মানুষ, তাহার জীবন, তাহার স্নেহ-প্রেম, শৌর্য-বীর্য, শিল্প-জ্ঞান, যাগ-যজ্ঞ, ধর্ম-কর্ম সমস্ত লইয়া বিশ্ব-সৃষ্টি যেন তাহার বিপুল সমগ্রতার ভিতরে একটা বিশেষ রূপ লইয়া কবির বাসনারাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিল। জগৎকে এবং জীবনকে তিনি একটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে বিশেষ করিয়া দেখিয়াছেন, বিশেষ করিয়া অনুভব করিয়াছেন। সেই সকল দেখা, সকল অনুভূতিই আবার কাব্যে রূপ পাইয়াছে সমগ্রতার বৈচিত্র্যে। প্রকৃতির ভিতর দিয়া তিনি এমন ছবিও অনেক আঁকিয়াছেন যাহাকে আজকালকার দিনে আমরা আর একটু যবনিকান্তরালে ঢাকিয়া রাখিয়া কথা বলিতে চাই। কিন্তু অন্যদিকে

আবার তাঁহার চিন্তার মঙ্গলময় শুভ্রতা—তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিক সুর আমাদিগকে শ্রদ্ধাবনত করিয়া দেয়। উদারার নিম্নতম ঘাটে সুর বাঁধিয়া মুদারা অতিক্রম করিয়া তারার সর্বশেষ ঘাটে সুর পৌঁছাইতেও কবিকে যেন কোথাও একটা বেগ পাইতে হয় নাই। এই ওঠা-নামার ভিতরে কৃত্রিমতা নাই—সকল জিনিসটাই যেন তাঁহার নিকটে ছিল অতি সহজসাধ্য—সর্বত্র রহিয়াছে একটা সাবলীল ছন্দ।

'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র ভিতরে রাজ্ঞী ধরণী যখন সন্ন্যাসিনী কৌশিকী সহ শোভা পাইতেছিলেন তখন রাজা বলিতেছেন,—

মঙ্গলালঙ্কৃতা ভাতি কৌশিক্যা যতিবেষয়া।
ত্রয়ী বিগ্রহবত্যেব সমমধ্যাত্মবিদ্যয়া ॥

মঙ্গল অলঙ্কারে ভূষিতা রাণীর পার্শ্বে যতিবেশ-ধারিণী কৌশিকীকে দেখিয়া মনে হইতেছে বিগ্রহবতী ত্রিগুণাত্মিকা বেদবিদ্যা যেন অধ্যাত্মবিদ্যার সহিত শোভা পাইতেছে। রাণী নিজেও মঙ্গলালঙ্কৃতা, তাঁহার সম্পদের সহিত –রাজশক্তির সহিত—যোগ হইয়াছে মাঙ্গল্যের, তাই তিনি ত্রিগুণাত্মিকা বেদবিদ্যা; সন্ন্যাসিনী কৌশিকী বিগ্রহবতী বেদান্তবিদ্যা। ইহার পরে দেখিতে পাই পরিব্রাজিকা কৌশিকী রাজাকে আশীর্বাদ করিতেছেন,—

মহাসারপ্রসবয়োঃ সদৃশক্ষময়োর্দ্বয়োঃ।
ধারিণী-ভূতধারিণ্যোর্ভব ভর্তা শরচ্ছতম্ ॥

ভূতধাত্রী বসুন্ধরা যেমন বহুমূল্য রত্নপ্রসবা,—সে যেমন সর্বক্ষমা—তেমনি বীরপুত্র প্রসবিনী এবং ধরিত্রীর মত সহনশীলা তোমার এই রাণী 'ধরণী'; তুমি শতবৎসর কাল এই উভয়ের ভর্তা হইয়া জীবিত থাক। ধরিত্রীর মতন রত্ন-গর্ভা এবং ধরণীর মত সহনশীলা

রাণীমূর্তিখানি যেন একটা অনির্বচনীয় মহিমায় দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

'রঘুবংশে'র ভিতরে দেখিতে পাই, সাধ্বী রমণীগণের অগ্রগণ্যা, মহারাজ দিলীপের ধর্মপত্নী সুদক্ষিণা হোমধেনু নন্দিনীর পবিত্র পাদস্পর্শে পূত ধূলিময় পথে নন্দিনীকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে; মনে হয়, মূর্তিমতী স্মৃতি যেন মূর্তিমতী শ্রুতির অর্থরূপ পথকে অনুসরণ করিতেছে।

তস্যাঃ খুরন্যাস-পবিত্রপাংশু-
মপাংশুলানাং ধুরি কীর্তনীয়া।
মার্গং মনুষ্যেশ্বর-ধর্মপত্নী
শ্রুতেরিবার্থং স্মৃতিরন্বগচ্ছৎ॥ (২।২)

রাণী সুদক্ষিণাকে সাক্ষাৎ শ্রুতির অনুগামিনী স্মৃতি বলিয়া অভিহিত করিতে হইলে কি ভাবে যে রাণীকে আনিয়া চোখের সম্মুখে ধরিতে হয় তাহা কালিদাসের জানা ছিল; তাই পূর্বাহ্ণে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তবে কবি অন্য ছবিটি আঁকিলেন। সুদক্ষিণা একদিকে 'অপাংশুলানাং ধুরি কীর্তনীয়া'—অন্যদিকে 'মনুষ্যেশ্বর-ধর্মপত্নী',—তাই সেই রাণী হোমধেনু নন্দিনীর পশ্চাতে সাক্ষাৎ স্মৃতিস্বরূপিণী। হোমধেনু নন্দিনী সম্বন্ধে দেখিতে পাই,—

তাং দেবতাপিত্রতিথি-ক্রিয়ার্থা-
মন্বগ্ যযৌ মধ্যমলোকপালঃ।
বভৌ চ সা তেন সতাং মতেন
শ্রদ্ধেব সাক্ষাদ্ বিধিনোপপন্না॥ (২।১৬)

পৃথিবীপালক দিলীপ দেবতালোক, পিতৃলোক এবং অতিথিগণের প্রতি কর্তব্য-সাধনের সহায়রূপিণী নন্দিনীর পশ্চাতে পশ্চাতে

চলিতেছিলেন ; সজ্জনের নিকটেও সম্মানার্হ রাজা দিলীপ কর্তৃক অশেষ শ্রদ্ধা সহকারে সেব্যমানা গাভীটিকে মনে হইতেছিল যেন সজ্জনগণের মত-সম্মত বিধির সহিত শোভমানা সাক্ষাৎ শ্রদ্ধা।

'রঘুবংশে' রামচন্দ্র প্রভৃতির জন্ম বর্ণনায় দেখি, পতিপরায়ণা অগ্র-মহিষী কৌশল্যা হইতে রামের জন্ম—যেন রাত্রিকালে ওষধি হইতে তমোনাশক জ্যোতির আবির্ভাব।—

অথাগ্র্যমহিষী রাজ্ঞঃ প্রসূতিসময়ে সতী।
পুত্রং তমোঽপহং লেভে নক্তং জ্যোতিরিবৌষধিঃ ॥ (১০।৬৬)

ভরত মাতা কৈকেয়ীর অঙ্গ শোভিত করিল—যেমন বিনয় শোভা করে শ্রীকে।

জনয়িত্রীমলঞ্চক্রে যঃ প্রশ্রয় ইব শ্রিয়ম্ ॥ (১০।৭০)

মাতা সুমিত্রা প্রসব করিলেন দুইটি পুত্র, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন—যেমন সম্যক্ আরাধিতা বিদ্যা জন্মদান করে প্রজ্ঞা ও বিনয়কে।

সম্যগারাধিতা বিদ্যা প্রবোধবিনয়াবিব॥ (১০।৭১)

মহারাণী কুমুদ্বতী মহারাজ কুশ হইতে একটি পুত্র লাভ করিল ; কবি বলিলেন, রাণীর এই পুত্রলাভ যেন শেষরজনীর কাছ হইতে মানুষের প্রসন্ন চেতনা লাভ।

অতিথিং নাম কাকুৎস্থাৎ পুত্রং প্রাপ কুমুদ্বতী।
পশ্চিমাদ্ যামিনীযামাৎ প্রসাদমিব চেতনা ॥ (১৭।১)

মহর্ষি বাল্মীকি যখন আশ্রমবাসিনী ব্রহ্মচারিণী সীতা এবং তাহার শিশুপুত্রদ্বয় সহ রাজসভায় রামের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন মনে হইল, এক পরম ঋষি যেন উদত্তাদিস্বরবিশুদ্ধিযুক্তা গায়ত্রী সহ উদীয়মান সবিতার সম্মুখীন হইয়াছেন।

স্বরসংস্কারবত্যাসৌ পুত্রাভ্যামথ সীতয়া।

ঋচেবোদর্চিষং সূর্যং রামং মুনিরুপস্থিতঃ॥ (১৫।৭৬)

মহর্ষি বাল্মীকির সহিত শুদ্ধা সীতা যেন মূর্তিমতী গায়ত্রী,—সেই গায়ত্রী-কল্পা জননীর পাশে শিশুপুত্র দুইটি যেন গায়ত্রীর উদাত্তাদির স্বরশুদ্ধি; সম্মুখের রামচন্দ্র যেন উদীয়মান সূর্য। মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রিতা সীতার মূর্তি যেন অনির্বচনীয় পবিত্র মহিমায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

মহর্ষি মারীচের তপোবনে ধৃতৈকবেণী শকুন্তলা, কুমার সর্বদমন এবং রাজা দুষ্যন্তকে দেখিয়া মহর্ষি মারীচ বলিয়াছিলেন,—

দিষ্ট্যা শকুন্তলা সাধ্বী সদপত্যমিদং ভবান্।

শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চেতি ত্রিতয়ং তৎ সমাগতম্॥

সাধ্বী তপস্বিনী শকুন্তলা যেন সাক্ষাৎ শ্রদ্ধা,—রাজা দুষ্যন্ত যেন সাক্ষাৎ বিধি,—আর সেই বিধি এবং পরম শ্রদ্ধার মিলনে জন্ম লাভ করিয়াছে এই সর্বদমন রূপ মূর্তিমান্ বিত্ত।

'রঘুবংশে' দেখিতে পাই রাজা দিলীপ পরিণত বয়সে নবনবতি মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিবার পর সাংসারিক বিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত হইলেন এবং যুবা পুত্র রঘুকে যথাবিধি রাজ্য দান করিলেন। বীর্যবান্ রঘু রাজশক্তি লাভ করিয়া অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন—যেমন অধিক প্রদীপ্ত হইয়া ওঠে হুতাশন—দিনান্তে সূর্যের তেজ তাহাতে যখন নিহিত হয়।

স রাজ্যং গুরুণা দত্তং প্রতিপদ্যাধিকং বভৌ।

দিনান্তে নিহিতং তেজঃ সবিত্রেব হুতাশনঃ॥ (৪।১)

পরিণত বয়সে রাজা রঘু আবার যখন যোগ্য রাজকুমার অজের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন—

প্রশমস্থিতপূর্বপার্থিবং
কুলমভ্যুদ্যতনূতনেশ্বরম্।
নভসা নিভৃতেন্দুনা তুলা-
মুদিতার্কেণ সমারুরোহ তৎ॥ (৮।১৫)

একদিকে পূর্বরাজা প্রশমিত,—অন্যদিকে নূতন রাজার অভ্যুদয়; রাজকুল যেন অস্তমিতপ্রায় চন্দ্র এবং উদীয়মান সূর্য লইয়া আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

বৃদ্ধরাজ রঘু সন্ন্যাসের চিহ্ন ধারণ করিলেন,—যুবরাজ অজ রাজচিহ্ন ধারণ করিলেন; তাঁহারা যেন পৃথিবীতে ধর্মের 'অপবর্গ' এবং 'অভ্যুদয়' রূপ দুইটি অংশেরই প্রতিমূর্তি (৮।১৬)। তারপরে একদিকে যুবরাজ অজ অজিতপদ লাভ করিবার মানসে নীতি-বিশারদ মন্ত্রিগণের সহিত মিলিত হইল,—অন্যদিকে বৃদ্ধ রাজা রঘু মোক্ষপদ প্রাপ্তির জন্য তত্ত্বদর্শী যোগিগণের সহিত মিলিত হইলেন (৮।১৭)। একদিকে যুবরাজ অজ প্রজাপুঞ্জের ভালমন্দ পর্যবেক্ষণের জন্য সিংহাসনে আরোহণ করিল, অন্যদিকে প্রাচীন নৃপতি রঘুও নিজের চিত্তের একাগ্রতা অভ্যাসের জন্য বিজনে পবিত্র কুশাসন গ্রহণ করিলেন (৮।১৮)। একদিকে রাজকুমার অজ নিজের রাজ্যের নিকটবর্তী সকল রাজন্যবর্গকে নিজের প্রভুশক্তিসম্পদের দ্বারাই বশে আনিল,—অন্যদিকে রঘু সমাধিযোগের অভ্যাস দ্বারা নিজের শরীর-গত পঞ্চ বায়ুকে বশে আনিয়াছিলেন (৮।১৯)। একদিকে নবীন যুবরাজ অজ শত্রুদিগের সকল প্রতিকূল চেষ্টার ফল ভস্মসাৎ করিয়া দিতে লাগিল,—অন্যদিকে রঘু জ্ঞানময় বহ্নিদ্বারা নিজের সকল কর্মফল ভস্মসাৎ করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলেন (৮-২০)। সন্ধি-বিগ্রহ প্রভৃতি ছয়টি গুণের ফল চিন্তা করিয়া অজ তাহাদিগকে প্রয়োগ

করিতে লাগিল ; রঘুও লোষ্ট্র এবং কাঞ্চনে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া গুণত্রয় জয় করিলেন (৮।২১)। স্থিরকর্মা নবীন ভূপতি ফলোদয় না হওয়া পর্যন্ত কর্ম হইতে কিছুতেই বিরত হইতেন না ; আর স্থিতধী প্রবীণ নরপতিও পরমাত্ম-দর্শনের পূর্ব পর্যন্ত যোগবিধি হইতে ক্ষান্ত হইলেন না (৮।২২)।

ইতি শত্রুষু চেন্দ্রিয়েষু চ
প্রতিযিদ্ধ-প্রসরেষু জাগ্রতৌ।
প্রসিতাবুদয়াপবর্গয়ো-
রুভয়ীং সিদ্ধিমুভাববাপতুঃ ॥ (৮।২৩)

এইরূপে তাঁহারা পিতাপুত্রে একে শত্রুর এবং অন্যে ইন্দ্রিয়ের স্বার্থ-প্রবৃত্তি নিবারণ করিয়া এবং একে অভ্যুদয় এবং অন্যে অপবর্গের প্রতি আসক্ত হইয়া উভয়েই উভয়ের অনুরূপ সিদ্ধিলাভ করিলেন।

শ্লোকগুলির ভিতর দিয়া কবি মানুষের প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি ধর্মকে সত্যই যেন কুমার অজ এবং বৃদ্ধ নরপতি রঘুর ভিতরে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব,—সমস্ত তুলনার ভিতরে রহিয়াছে একটা গুণকর্মের পরস্পরবিরোধী পার্থক্য। দুইদিকে এই পরস্পরবিরোধী গুণকর্মগুলিকে সাজাইয়া দিয়া একটা পরস্পর বৈপরীত্যের ভিতরে দুইটি চিত্রকে অতি স্পষ্ট করিয়া তোলা হইয়াছে।

উপসংহার

আমরা কালিদাসের কাব্য-বারিধি হইতে কয়েকটিমাত্র উপমা-রত্ন তুলিয়া দেখাইলাম। কালিদাসের কাব্যে এই জাতীয় উপমাকে বিশেষ করিয়া খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিতে হয় না,—কাব্য খুলিলেই দুই একটি উপমা আপনিই চোখে পড়িয়া যাইবে। 'রঘুবংশ' লিখিতে আরম্ভ করিয়া কবি কিছুক্ষণ শুধু উপমা দিয়াই কাব্য চালাইলেন! প্রথমে তিনি বাগর্থের ন্যায় নিত্য সংযুক্ত পার্বতী-পরমেশ্বরকে প্রণাম করিলেন। ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া বিশাল সূর্যবংশের কাহিনী রচনা-প্রয়াসকে ভেলায় সাগর পার হইবার চেষ্টার সহিত তুলনা করিলেন, মন্দ কবিযশঃপ্রার্থী নিজেকে চন্দ্রলাভের নিমিত্ত উদ্বাহু বামনের ন্যায় উপহাসযোগ্য মনে করিলেন,—পূর্বসূরিগণ বাল্মীকি প্রভৃতির প্রদর্শিত পথে কাব্য রচনা সম্বন্ধে বলিলেন,—'মণৌ বজ্র-সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ'—অর্থাৎ বজ্রের (হীরকাদি মণি-বেধক) দ্বারা বিদ্ধ কঠিন মণির ভিতরে যেন সূত্রের গতি। বাহিরের জগৎটার সকল দৃশ্য, গন্ধ, গান সকল সময়ের জন্য এমন করিয়া কবির মনের ভিতরে ভিড় করিয়া আছে যে, 'ইব' এবং 'এব' ছাড়া কবি আর কথা বলিতে পারেন না। কিন্তু এই যে তাঁহার সমস্ত কাব্য ভরা শুধু 'ইব' এবং 'এব'র ছড়াছড়ি তাহাতে কখনও মনে হয় না কোথাও কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে, অথবা কৃত্রিম অলঙ্কার প্রয়োগের আপ্রাণ কসরতের দ্বারা কবি নিজেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন এবং কাব্যকেও অতিরিক্ত অলঙ্কারভারে একেবারে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছেন। উপমা-প্রয়োগ কালিদাসের স্বাভাবিক বচন-ভঙ্গি। একই শ্লোকের মধ্যে যখন কবি একেবারে উপমার মালা বসাইয়া গিয়াছেন সেখানেও চাতুর্যের মধ্যে একটা

চমৎকারিত্বকে আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। যেমন 'মেঘদূতের উত্তর মেঘের প্রথম শ্লোক—

> বিদ্যুদ্বন্তং ললিতবণিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
> সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্।
> অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
> প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ॥

আকাশের মেঘ আর অলকাপুরীর প্রাসাদগুলি যে একেবারে সমান ভাবে তুলনীয়, শ্লোকটির ভিতর দিয়া সেই কথাই বলা হইয়াছে। মেঘের আছে বিদ্যুৎ—অলকার প্রতি প্রাসাদে আছে 'ললিত-বনিতা' —যাহারা বিদ্যুতের মতনই লাস্যময়ী এবং রূপপ্রভায় চোখ ধাঁধায়; মেঘে আছে ইন্দ্রধনু, প্রাসাদগুলিতে আছে বিচিত্রবর্ণের চিত্রণ; মেঘের আছে স্নিগ্ধ গম্ভীর ধ্বনি—আর অলকার প্রাসাদে প্রাসাদে আছে সঙ্গীতের জন্য প্রহত মৃদঙ্গের গুরু গুরু রব; মেঘ যেমন অন্তস্তোয়—অর্থাৎ জলভরা থাকায় ভিতরে তরলাকারা—প্রাসাদ-গুলির মণিময় স্বচ্ছ অঙ্গনগুলিও ঠিক সেইরূপই; মেঘও যেমন গগনস্পর্শী—প্রাসাদগুলিও তেমনিই গগনস্পর্শী,—সুতরাং সব দিক হইতেই তাহারা সমান।

আলঙ্কারিকের সূক্ষ্ম-বিচারে কালিদাসের এই সকল উপমা প্রয়োগের ভিতরে হয়ত অনেক গুণের সহিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দোষও কিছু কিছু বাহির হইতে পারে। এমনকি মহাদেবের ঈষৎচিত্ত চাঞ্চল্যের দৃশ্যটি সম্বন্ধেও আলঙ্কারিক দৃষ্টিতে এই আপত্তি তোলা যাইতে পারে যে, এখানে একই শ্লোকের ভিতরে দুইটি প্রধান উপমা প্রয়োগ করা হইয়াছে,—একটি চন্দ্রোদয়ের আরম্ভে অম্বুরাশির সহিত কিঞ্চিৎপরি-লুপ্তধৈর্য মহাদেবের তুলনা,—অপরটি উমা মুখের অধরোষ্ঠের সহিত

বিম্বফলের তুলনা। আলঙ্কারিকগণের চিকণ বিচারে এখানে এই অভি-যোগ আনা যাইতে পারে যে আমাদের মন যুগপৎ দুইটি দৃশ্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াতে কোন দৃশ্যের রসনাভূতিই সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই, কালিদাসের উপমার মৌলিকতা, সূক্ষ্মতা, গভীরতা—তাহার বৈচিত্র্য এবং ঔচিত্যের ভিতরে এমন একটা অনির্বচনীয় মহিমায় পাঠকের চিত্ত বিস্মিত, মুগ্ধ এবং চমৎকৃত হইয়া যায় যে, এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ যেন মনে আর রেখা-পাত করিতে পারে না। আমাদের সাধারণ চক্ষে যে সূর্যকে আমরা শুধু জ্যোতির্মণ্ডল বলিয়া জানি, বৈজ্ঞানিকের দূরবীক্ষণের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহার ভিতরেও হয়ত কত অন্ধকার রন্ধ্র আবিষ্কৃত হইয়া পড়িতে পারে; গবেষকের সে আবিষ্কার প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক সত্য হইতে পারে,—কিন্তু আমরা যাহারা প্রভাতে মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায় সূর্য-কিরণের বর্ণ-বৈচিত্র্য এবং ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া বিস্ময় মানিয়াছি, তাহাদের নিকটে উহা একটা প্রকাণ্ড সত্য নহে। কালিদাসের উপমায় কষ্ট-কল্পনার ক্লিষ্টতা বা বাঁধা-রীতির রসবৈচিত্র্যহীনতা কোথাও নাই এমন কথা বলিতে পারি না,—কিন্তু তাঁহার কাব্যের ভিতরে উহা ঐ সূর্য-মণ্ডলের অন্ধকার রন্ধ্রের ন্যায়—পাঠক চিত্তকে তাই তাহা পীড়িত করে না।

এই সকল উপমা প্রয়োগের ভিতর দিয়া কালিদাসের কাব্যে যে জিনিসটি আমাদের চিত্তকে গভীরভাবে দোলা দেয়, তাহা কবি প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য। সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া কবির একটা বিশেষ সত্তার একটা অমোঘ স্পর্শ লাভ করি আমরা প্রতিমুহূর্তে। কবি-প্রতিভার স্পষ্টতম পরিচয়ই সেখানে, যেখানে কবির ব্যক্তি-পুরুষ তাহার স্পর্শে নিরন্তর সহৃদয় পাঠকের চেতনার ভিতরে আনিতেছে আলোড়ন,—

এবং সেই আলোড়নের স্পন্দনে কবির ব্যক্তি-পুরুষ নিরন্তর উঠিতেছে পাঠকের হৃদয়ে একান্ত স্পর্শযোগ্য হইয়া। কাব্যের ভিতর দিয়া কবির এই যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্পন্দন—এই যে তাহার অমোঘ স্পর্শ—তাহা কালিদাসের কাব্যকে দান করিয়াছে একটা বিরাট স্বাতন্ত্র্যের মহিমা। কালিদাসের আবির্ভাবের পর বহু শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে,—বহু সাহিত্য রচিত হইয়াছে,—কিন্তু আজও মনে হয়, সাহিত্যের দরবারে আপন প্রতিভার গৌরবে কালিদাস যে স্থান অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছেন,—আজও সে আসনের অধিকারী শুধু কালিদাস।

— o —